Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সমকালীন বিশ্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইবরাহিম ইবনু আহমেদ

রোলঃ 23100110150

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সমকালীন বিশ্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইবরাহিম ইবনু আহমেদ

রোলঃ 23100110150

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সমকালীন বিশ্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইবরাহিম ইবনু আহমেদ, আইডিঃ 23100110150 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সমকালীন বিশ্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Ibrahim Ibn Ahmad

(স্বাক্ষর)

ইবরাহিম ইবনু আহমেদ

আইডিঃ 23100110150

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা (Introduction)

- **১.১ বিষয়ের অবতারণা:** ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সমকালীন বিশ্ব।
- **১.২ গবেষণার গুরুত্ব:** বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা।
- **১.৩ ভুল ধারণার সংক্ষিপ্ত চিত্র:** বর্তমান বিশ্বে জিহাদ শব্দটিকে যেভাবে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে তার একটি প্রাথমিক ধারণা।

অধ্যায় ২: জিহাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা (Definition of Jihad)

- **২.১ ভাষাগত বা আভিধানিক অর্থ:** 'জিহাদ' শব্দের মূল ধাতু, এর আক্ষরিক অর্থ (প্রচেষ্টা, সাধনা, কষ্ট স্বীকার)।
- **২.২ শরীয়তের পরিভাষায় সংজ্ঞা:** ইসলামী আইন বা ফিকহের দৃষ্টিতে জিহাদের প্রকৃত অর্থ ও এর ব্যাপকতা।

অধ্যায় ৩: উৎস গ্রন্থে জিহাদের বিবরণ (Scriptural Basis of Jihad)

- **৩.১ কুরআনে জিহাদ:** পবিত্র কুরআনের প্রধান প্রধান আয়াতসমূহ, যেখানে জিহাদের আদেশ, উদ্দেশ্য এবং পরিধি বর্ণনা করা হয়েছে (ব্যাখ্যা ও শানে নুযূলসহ)।
- **৩.২ হাদিসে জিহাদ:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী ও কর্মের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব এবং এর প্রয়োগিক দিক।

অধ্যায় ৪: জিহাদের প্রকারভেদ (Types of Jihad)

- **৪.১ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ:** আত্মসংযম, প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সংগ্রাম (জিহাদ বিন-নফস)।
- **৪.২ শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ:** শয়তানের কুপ্ররোচনা ও ওয়াসওয়াসা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার অবিরাম লড়াই।
- **৪.৩ দাওয়াহ ও জ্ঞান দ্বারা জিহাদ:** লেখনী, বক্তৃতা, যুক্তি এবং শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের সঠিক বাণী প্রচার (জিহাদ বিল-ইলম ওয়াল-লিসান)।
- **৪.৪ সশস্ত্র জিহাদ (শর্তসাপেক্ষ):** রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সশরীরে যুদ্ধ।

অধ্যায় ৫: সশস্ত্র জিহাদের শর্ত ও নীতিমালা (Conditions and Ethics of Armed Jihad)

গুরুত্বপূর্ণ নোট: যুদ্ধাবস্থায় ইসলামের কঠোর মানবিক নীতিমালা।

- **৫.১ নিরপরাধ হত্যা ও আগ্রাসন নিষিদ্ধকরণ:** সাধারণ নাগরিক ও অযুদ্ধের সাথে জড়িতদের নিরাপত্তার বিধান।
- **৫.২ নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের সুরক্ষা:** যুদ্ধক্ষেত্রে কাদের ওপর আঘাত করা যাবে না, তার সুস্পষ্ট অনুশাসন।
- **৫.৩ পরিবেশ ও সম্পদের নিরাপত্তা:** গাছপালা ধ্বংস না করা, ফসলের ক্ষতি না করা এবং উপাসনালয় সুরক্ষিত রাখার নিয়ম।
- **৫.৪ আত্মরক্ষা ও ন্যায়বিচার:** যুদ্ধ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার্থে এবং জুলুমের অবসান ঘটাতে—কোনো সাম্রাজ্যবাদী বা জোরপূর্বক আগ্রাসন নয়।

অধ্যায় ৬: সমকালীন বিশ্বে জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা ও আধুনিক প্রেক্ষাপট (Misconceptions & Modern Context)

- **৬.১ ভুল ধারণা ১:** জিহাদ মানেই সন্ত্রাসবাদ (Terrorism) বা চরমপন্থা—এর যৌক্তিক খণ্ডন।
- **৬.২ ভুল ধারণা ২:** ইসলাম জোরপূর্বক ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তলোয়ার ব্যবহার করেছে—ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা।
- **৬.৩ আধুনিক প্রেক্ষাপটে জিহাদের রূপান্তর:**
    - জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনকে জিহাদ হিসেবে বিবেচনা।
    - সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ও সমাজ সংস্কার (Social Reform)।

অধ্যায় ৭: উপসংহার ও রেফারেন্স (Conclusion & References)

- **তথ্যসূত্র (References):** কুরআন, হাদিস গ্রন্থ (বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি), ফিকহের বিখ্যাত কিতাবসমূহ এবং নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল।

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المجاهدين وإمام المتقين محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين

[সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক। আর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক মুজাহিদদের নেতা এবং মুত্তাকিদের (পরহেজগারদের) ইমাম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর, এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবির ওপর।]

অধ্যায় ১: ভূমিকা (Chapter 1: Introduction)

১.১ বিষয়ের অবতারণা (Context and Overview)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান (Complete Code of Life)। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য প্রদত্ত প্রতিটি আদেশ-নিষেধ বান্দার প্রতি তাঁর একেকটি করুণা ও দয়া। জমিনে কপাল রাখো, মুরতাদ ও শাতিমে রাসুলদের গর্দান উড়িয়ে দাও, সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি রোজা রাখো, চোরের হাত কেটে দাও, হজের সময় আরাফার বালুমাটিতে কিছু সময় অবস্থান করো, জিন্দিকের শিরশ্ছেদ করে দাও, শয়তানকে পাথর মারার ইবরাহিমি সুন্নাহর অনুকরণে ইট-বালু-সিমেন্টের তৈরি খুঁটিতে পাথর নিক্ষেপ করো, আমার দুশমন হিন্দু-বৌদ্ধ-ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান-নাস্তিকদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা রাখো, আমার জিকির করো, সম্মিলিত কোনো ফরজ আদায় করতে গেলে আমির নির্ধারণ করে নাও, তাকওয়া অর্জনের জন্য পশুর গলায় ছুরি চালাও, তোমাদের শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে জোরপূর্বক ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দাও, সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করো, পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি-মাটির ব্যবস্থা রাখো, শিরক-কুফর থেকে আল্লাহর জমিনকে পবিত্র করতে তির-ধনুক-বল্লম প্রস্তুত করো, শক্তি অর্জন করো, শরিয়তের প্রতিটি অধ্যায়ের ইলম হাসিল করো, ইলমের দাবি অনুযায়ী আমল করো, ব্যভিচারের মতো অপকর্মে লিপ্ত হলে শত গুণের অধিকারী অবিবাহিত মানুষটিকেও ১০০ চাবুক মারো; আর বিবাহিত হলে পাথর ছুড়ে হত্যা করো, ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়নের জন্য একজন খলিফা নির্বাচন করো, ধনী ব্যক্তির অর্জিত সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ জাকাত হিসেবে গরিবদের বিলিয়ে দাও, বিশ্বের কোথাও কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা ইসলামি ভূখণ্ড আক্রান্ত হলে তা উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ো, আল্লাহর বন্ধুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো এবং আল্লাহর দুশমনকে দুশমন জ্ঞান করো। এগুলো এবং এগুলোর মতো আরও শত-হাজার হুকুমের প্রত্যেকটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য একেকটি দয়া, করুণা ও স্নেহের প্রকাশ। কারণ, এগুলো আল্লাহর হুকুম। আল্লাহপ্রদত্ত হুকুমগুলো বান্দার জন্য শতভাগ কল্যাণকর, যার কিছু বান্দার বুঝে আসে, আর কিছু বুঝে আসে না। কখনো বুঝে আসে, আবার কখনো বুঝে আসে না।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার উদ্দেশ্য মানবজাতিকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের দিকে পরিচালিত করা এবং পৃথিবীতে তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠা করা। এই মহান

উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম যে সকল উপায় ও মাধ্যম নির্ধারণ করেছে, তার মধ্যে 'জিহাদ' একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ বিধান। কুরআন মাজীদ ও সুন্নাহয় জিহাদের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এসেছে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এটি একটি মৌলিক বাস্তবতা হিসেবে বিদ্যমান।

ধ্রুপদী মুসলিম আলিমগণ জিহাদকে ইসলামের অন্যতম মহান ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল জিহাদ-এ জিহাদের ফযীলত, মর্যাদা এবং উম্মাহর জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) জিহাদকে নবী-রাসূলগণের অন্যতম মহান দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং মানবজীবনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

তবে বর্তমান বিশ্বে 'জিহাদ' শব্দটি সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত ও ভুল বোঝাবুঝির শিকার ইসলামী পরিভাষাগুলোর একটি। একদিকে কিছু ইসলামবিদ্বেষী ধারা জিহাদকে কেবল সহিংসতা, রক্তপাত ও উগ্রবাদের প্রতিশব্দ হিসেবে উপস্থাপন করে; অন্যদিকে কিছু মুসলিম লেখক ও চিন্তাবিদ জিহাদের শরয়ী ও ঐতিহাসিক অর্থকে সংকুচিত করে একে কেবল আত্মশুদ্ধি বা নৈতিক সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। ফলে জিহাদের প্রকৃত ধারণা সাধারণ মানুষের নিকট অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে।

বিশেষত ঔপনিবেশিক যুগের পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিশ্বমাধ্যম এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক সংঘাতের কারণে জিহাদ বিষয়ে বহুমাত্রিক আলোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সমকালীন বিশ্বে মুসলিম সমাজের সামনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহীনের ব্যাখ্যার আলোকে জিহাদের প্রকৃত ধারণা অনুধাবন করা এবং এর উদ্দেশ্য, নীতিমালা ও সীমারেখা যথাযথভাবে নির্ধারণ করা।

থিসিসের এই মূল বিষয়বস্তু—**"ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও সমকালীন বিশ্ব"**—মূলত একটি ভারসাম্যপূর্ণ পর্যালোচনার দাবি রাখে। এই গবেষণাপত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদের মৌলিক ধারণা, এর শরয়ী ভিত্তি, উদ্দেশ্য, প্রকারভেদ, বিধিবিধান এবং সমকালীন বিশ্বে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি জিহাদ সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাসমূহ বিশ্লেষণ করে ধ্রুপদী ইসলামী উৎসসমূহের আলোকে একটি সুস্পষ্ট ও প্রামাণ্য চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে। এর মাধ্যমে পাঠক ইসলামী

শরীয়তে জিহাদের প্রকৃত অবস্থান এবং বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন, ইনশাআল্লাহ।

১.২ গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (Significance of the Research)

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে কেন্দ্র করে যে সেকুলাররা, কুফফাররা, অরিয়েন্টালিস্ট এবং ইসলামের আরো শত্রুরা যেই সমস্ত বিতর্ক তৈরি করেছে, তার কেন্দ্রে রয়েছে 'জিহাদ' ও 'সশস্ত্র সংগ্রাম' সম্পর্কিত ধারণাটি। এই গবেষণার গুরুত্ব মূলত নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে অপরিসীম:

১. **তাত্ত্বিক বিকৃতির অবসান:** একদিকে একশ্রেণীর ইসলামবিদ্বেষী বুদ্ধিজীবী ও গণমাধ্যম জিহাদকে "সন্ত্রাসবাদ" বা "জোরপূর্বক ধর্ম প্রচারের হাতিয়ার" হিসেবে চিত্রায়িত করছে, অন্যদিকে ইসলামের নামধারী কিছু গোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক ও গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জিহাদের অপব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। অপরদিকে আরেকটি শ্রেণি রয়েছে, যারা নিজেদের দুর্বলতা, ভীরুতা কিংবা কর্মবিমুখতাকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে জিহাদ থেকে বিরত থাকার জন্য নানাবিধ অজুহাত ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। তারা জিহাদের এমন একটি ব্যাখ্যা প্রদান করে, যাতে সশস্ত্র সংগ্রাম বা যুদ্ধকে সর্বশেষ এবং প্রায় অপ্রাসঙ্গিক একটি বিকল্প হিসেবে চিত্রিত করা হয়। অথচ কুরআন, সুন্নাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই দুই চরমপন্থার মাঝে ইসলামের মধ্যপন্থা (Wasatiyyah) তুলে ধরা এই গবেষণার মূল দাবি।

২. **মানবিক ও নৈতিক নীতিমালার উন্মোচন:** আধুনিক গণমাধ্যম, বিনোদন সংস্কৃতি এবং তাৎক্ষণিক আবেগনির্ভর তথ্যপ্রবাহের যুগে মানুষ প্রায়শই গভীর চিন্তা ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের পরিবর্তে আবেগের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ফলে পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে প্রচারিত বহু বর্ণনা ও ধারণা যাচাই-বাছাই ছাড়াই গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা যায়। অথচ মুসলিমের জন্য সত্য ও মিথ্যার সর্বোচ্চ মানদণ্ড হলো আল্লাহ তাআলার ওহি।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

“যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।” (সূরা আল-মুলক: ১৪)

মানবজাতির স্রষ্টা হিসেবে মানুষের প্রকৃতি, সামর্থ্য, দুর্বলতা এবং সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলারই রয়েছে। অতএব যুদ্ধ, শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণ সম্পর্কিত তাঁর বিধানও পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই প্রণীত।

এ প্রেক্ষাপটে কুরআনুল কারিমে যুদ্ধক্ষেত্রের নির্দেশনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ

“অতঃপর যখন তোমরা যুদ্ধে কাফিরদের মুখোমুখি হবে, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর।” (সূরা মুহাম্মাদ: ৪)

ইসলামী তাফসির ও ফিকহের আলোচনায় এ আয়াতকে যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব নির্দেশনা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে দ্রুত ও কার্যকরভাবে শত্রুকে মোকাবিলার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। অথচ ইসলামকে প্রায়ই নির্মমতা ও সহিংসতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যদিও আধুনিক বিশ্বের বহু রাজনৈতিক মতবাদ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের নামে সংঘটিত যুদ্ধ ও গণহত্যার ইতিহাস মানবজাতির সামনে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

গবেষণাটি দেখানোর চেষ্টা করবে যে, যুদ্ধ পরিচালনা, অযোদ্ধাদের সুরক্ষা, বন্দীদের অধিকার এবং নৈতিক সীমারেখা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলাম যে নীতিমালা প্রবর্তন করেছে, তা কেবল ঐতিহাসিকভাবেই নয়, বরং নৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গভীর গুরুত্ব বহন করে।

৩. আধুনিকায়ন ও প্রাসঙ্গিকতা: সমকালীন বিশ্বে যুদ্ধ ও সংগ্রামের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান যুগে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ (Ideological Warfare) এবং সাইবার ও অর্থনৈতিক যুদ্ধ অনেক বেশি দৃশ্যমান। এমতাবস্থায় জিহাদের আধুনিক ও বাস্তবসম্মত রূপ যেমন—শিক্ষা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং সমাজ সংস্কারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা সমসাময়িক মুসলিম যুবসমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১.৩ সমকালীন বিশ্বে ভুল ধারণার সংক্ষিপ্ত চিত্র (Overview of Contemporary Misconceptions)

বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'জিহাদ' শব্দটিকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়, তার সাথে এর মূল শাস্ত্রীয় সংজ্ঞার আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে। প্রথমত, পশ্চিমা ও মূলধারার বৈশ্বিক গণমাধ্যমগুলোতে জিহাদকে সরাসরি 'হলি ওয়ার' (Holy War) বা পবিত্র যুদ্ধ হিসেবে অনুবাদ করা হয়। অথচ ইসলামী পরিভাষায় 'হলি ওয়ার' বা 'পবিত্র যুদ্ধ' বলতে কোনো শব্দ নেই। যুদ্ধের জন্য ইসলাম 'কিতাল' (Qital) বা 'হার্ব' (Harb) শব্দ ব্যবহার করে, যা কেবল সুনির্দিষ্ট শর্তে এবং রাষ্ট্রীয় অধীনেই বৈধ।

দ্বিতীয়ত, নাইন-ইলেভেন (9/11) পরবর্তী সময়ে বৈশ্বিক ভূরাজনীতিতে ইসলামোফোবিয়াকে একটি বড় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে সাধারণ অমুসলিমদের মনে এই ধারণা গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে, একজন মুসলিমের ধর্মীয় দায়িত্বই হলো অমুসলিমদের হত্যা করা বা জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা। অথচ পবিত্র কুরআনের অমোঘ ঘোষণা—"দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।" (সূরা আল-বাকারা: ২৫৬)। সমকালীন বিশ্বে এই ভুল ধারণাগুলো কেবল মুসলিমদের জন্য সংকটের সৃষ্টি করেনি, বরং মুসলমানদের মাঝে অনেক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। এই থিসিস পেপারে সমকালীন এই আধুনিক ভুল ধারণাগুলোর উৎস এবং তার তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক খণ্ডন সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় মূলত গুণগত (Qualitative) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

প্রাথমিক উৎস

- পবিত্র আল-কুরআন
- সহীহ আল-বুখারী
- সহীহ মুসলিম
- সুনান আবু দাউদ
- জামে তিরমিযী
- অন্যান্য হাদিসগ্রন্থ

মাধ্যমিক উৎস

- তাফসীরে ইবনে কাসীর
- তাফসীরে তাবারী

- তাফসীরে কুরতুবী
- আধুনিক ইসলামী গবেষণা
- ইসলামী আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক গ্রন্থ
- গবেষণা নিবন্ধ ও জার্নাল

গবেষণায় তুলনামূলক, বিশ্লেষণধর্মী এবং বর্ণনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে।

অধ্যায় ২: জিহাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা (Chapter 2: Definition of Jihad)

২.১ ভাষাগত বা আভিধানিক অর্থ (Etymological and Literal Meaning)

“জিহাদ” শব্দটির একটি সাধারণ অর্থ এবং একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। “জিহাদের” সাধারণ অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, শরীয়তের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কালিমা বুলন্দ করার জন্য যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্ট ও মুশাককাত সহ্য করা হয় তাই জিহাদ, তা যে কোন পথেই হোক বা যে কোন পন্থায়ই হোক না কেন।

কিন্তু “জিহাদ” যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা, তার অর্থ হল, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করা, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা ও কাফের মুশরিকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।

“জিহাদে শরয়ী”র আসল অর্থ তাই। যা সাধারণ অবস্থায় ফরযে কিফায়া এবং বিশেষ অবস্থায় ফরযে ‘আইন’ হয়ে যায়।

আরবি ধাতু ও শব্দমূল

‘জিহাদ’ (الجهاد) শব্দটি আরবি "جَهَدَ" (জাহাদা) অথবা "جُهْد" (জুহদ) ধাতু থেকে উদ্ভূত।

আরবি ভাষাবিদদের মতে এই ধাতুর মূল অর্থ হলো—

- সর্বশক্তি প্রয়োগ করা
- কঠোর চেষ্টা করা
- সাধনা করা
- কষ্ট সহ্য করা
- সংগ্রাম করা

- নিজের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা

ইবন মানযুর (রহ.) তাঁর বিখ্যাত অভিধান *লিসানুল আরব*-এ লিখেছেন:
الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع والطاقة
অর্থাৎ,
"জিহাদ ও মুজাহাদা বলতে বুঝায় নিজের সর্বোচ্চ শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করা।"

২.২.২ "জুহদ" ও "জাহদ" এর পার্থক্য

আরবি ভাষাবিদগণ "جُهْد" (জুহদ) এবং "جَهْد" (জাহদ)-এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য উল্লেখ করেছেন।

জুহদ (جُهْد) অর্থ:

- সাধ্য
- সামর্থ্য
- শক্তি

জাহদ (جَهْد) অর্থ:

- কষ্ট
- কঠিন অবস্থা
- পরিশ্রম

অতএব জিহাদের মধ্যে দুটি বিষয় একত্রিত হয়েছে—

১. সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার।

২. কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার।

২.২.৩ আরবি সাহিত্যে জিহাদের ব্যবহার

ইসলাম-পূর্ব আরবি সাহিত্যেও জাহাদা ধাতু ব্যবহার করা হতো কঠিন প্রচেষ্টা বা সংগ্রামের অর্থে।

উদাহরণস্বরূপ—

- জীবিকা অর্জনের চেষ্টা
- মরুভূমির কষ্ট সহ্য করা
- শত্রুর মোকাবিলা করা
- কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরিশ্রম করা

এসব ক্ষেত্রেও জিহাদ শব্দের মৌলিক ধারণা ছিল "সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা"।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর জমিনে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জান, মাল, জবান, কলম এবং মেধা দিয়ে শয়তান, অন্যায়, জুলুম এবং নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করাকে পরিভাষায় জিহাদ বলে।

বিখ্যাত ফকীহ ইমাম ইবনে কায়্যিম (রহ.)-এর মতে, শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ হলো চার স্তরের একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া: নিজের নফসের সংশোধন, শয়তানের প্ররোচনা প্রতিরোধ, সমাজের অন্যায় ও বেদআতের বিরুদ্ধে জবান ও কলমের মাধ্যমে দাঁড়ানো এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জান-মাল দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

অধ্যায় ৩: উৎস গ্রন্থে জিহাদের বিবরণ (Chapter 3: Scriptural Basis of Jihad)

৩.১ কুরআনে জিহাদ (Jihad in the Quran)

জিহাদ ও মুজাহাদাহ সম্পর্কিত মৌলিক আয়াতসমূহ (Foundational Verses on Jihad and Striving)

সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২১৮ঃ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ ۤإِنّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াত ১৪২ -

ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ دْخُلُواْ ۖأَمْ حَسِبْتُمْ أَن ت

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে।

সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াত ১৯৫ -

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَـٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأُوذُواْ فِى سَبِيلِى وَقَـٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ

অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন পুরুষ অথবা মহিলা আমলকারীর আমল নষ্ট করব না। তোমাদের একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেব এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ; আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত ৯৫-৯৬ -

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওযরগ্রস্ত নয় এবং নিজদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ এক সমান নয়। নিজদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বসে থাকাদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে বসে থাকাদের উপর মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

دَرَجَـٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

তাঁর পক্ষ থেকে অনেক মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরাঃ আন-মায়েদা, আয়াত ৩৫ -

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَـٰهِدُواْ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং তার নৈকট্যের অনুসন্ধান কর, আর তার রাস্তায় জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফল হও।

সূরাঃ আল-আনফাল, আয়াত ৭২ -

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ ۤ إِنّ ن ِّ ِّ ن وَلَـٰيَتِهِم مِّنۢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَـٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ ۚ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ و

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সহায়তা করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদেরকে সাহায্যের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট কোন সহযোগিতা চায়, তাহলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে এমন কওমের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের একে অপরের চুক্তি রয়েছে এবং তোমরা যে আমল কর, তার ব্যাপারে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিমান।

সূরাঃ আল-আনফাল, আয়াত ৭৪ -

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۖ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক।

সূরাঃ আল-আনফাল, আয়াত ৭৫ -

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ

আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে জিহাদ করেছে, তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, আর আত্মীয়-স্বজনরা একে অপরের তুলনায় অগ্রগণ্য, আল্লাহর কিতাবে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত ১৬ -

أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تُتۡرَكُواْ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَلَمۡ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَلِيجَةٗۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত ১৯-২০ -

أَجَعَلۡتُمۡ سِقَايَةَ ٱلۡحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ كَمَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَجَٰهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ لَا يَسۡتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

তোমরা কি হাজীদের পানি পান করান ও মসজিদুল হারাম আবাদ করাকে ঐ ব্যক্তির মত বিবেচনা কর, যে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারা আল্লাহর কাছে বরাবর নয়। আর আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ أَعۡظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ

যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আর আল্লাহর পথে নিজদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তারা বড়ই মর্যাদাবান আর তারাই সফলকাম।

সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত ২৪ -

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত'। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত ৪১ -

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত ৪৪ -

لَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ أَن يُجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ

যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তারা তোমার কাছে তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি চায় না, আর আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।

সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত ৭৩ -

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম; আর তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান।

সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত ৮১ -

فَرِحَ الۡمُخَلَّفُوۡنَ بِمَقۡعَدِهِمۡ خِلٰفَ رَسُوۡلِ اللّٰهِ وَ كَرِهُوۡۤا اَنۡ يُّجَاهِدُوۡا بِاَمۡوَالِهِمۡ وَ اَنۡفُسِهِمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَ قَالُوۡا لَا تَنۡفِرُوۡا فِى الۡحَرِّ ؕ قُلۡ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوۡ كَانُوۡا يَفۡقَهُوۡنَ

পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে পেরে খুশি হল, আর তারা অপছন্দ করল তাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা বলল, ‘তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না’। বল, ‘জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, যদি তারা বুঝত’।

সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত ৮৬ -

وَ اِذَاۤ اُنۡزِلَتۡ سُوۡرَةٌ اَنۡ اٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ جَاهِدُوۡا مَعَ رَسُوۡلِهِ اسۡتَاۡذَنَكَ اُولُوا الطَّوۡلِ مِنۡهُمۡ وَ قَالُوۡا ذَرۡنَا نَكُنۡ مَّعَ الۡقٰعِدِيۡنَ

আর যখন কোন সূরা এ মর্মে নাযিল করা হয় যে, ‘তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সাথে জিহাদ কর’, তখন তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা তোমার কাছে অনুমতি চায় এবং বলে, ‘আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা বসে থাকা লোকদের সাথে থাকব’।

সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত ৮৮ -

لٰكِنِ الرَّسُوۡلُ وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ جٰهَدُوۡا بِاَمۡوَالِهِمۡ وَ اَنۡفُسِهِمۡ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الۡخَيۡرٰتُ ۫ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ

কিন্তু রাসূল ও তার সাথে মুমিনরা তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে, আর সে সব লোকের জন্যই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম।

সূরাঃ আন-নাহাল, আয়াত ১১০ -

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَٰهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ

তারপর তোমার রব তাদের জন্য, যারা বিপর্যস্ত হওয়ার পর হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে এবং সবর করেছে, এ সবের পর তোমার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল, দুয়ালু।

সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত ৭৮ -

وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ

আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন ‘মুসলিম’ পূর্বে এবং এ কিতাবেও। যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও। অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

সূরাঃ আল-ফুরকান, আয়াত ৫২ -

فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدۡهُم بِهِۦ جِهَادٗا كَبِيرٗا

সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর।

সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদের আনুগত্য করো না এবং তুমি এ (কুরআনে)র সাহায্যে ওদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও। [1]

[1] جاهدهم به এর ٥ (এ) সর্বনাম দ্বারা কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, কুরআন দ্বারা কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও। আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তখন জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়নি। সেই কারণে এর অর্থ হবে কুরআনের আদেশ

নিষেধকে প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা কর এবং কাফেরদের জন্য যেসব শাস্তির ধমক ও তিরস্কার বর্ণিত হয়েছে, তা তাদের সামনে স্পষ্ট কর।

সূরাঃ আল-আনকাবূত, আয়াত ৬ -

وَمَن جَٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ

আর যে চেষ্টা করে সে তো তার নাফ্সের জন্য চেষ্টা করে। নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টিকুল থেকে প্রয়োজনমুক্ত।

সূরাঃ আল-আনকাবূত, আয়াত ৬৯ -

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।

সূরাঃ মুহাম্মাদ, আয়াত ৩১ -

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কথা- কাজ পরীক্ষা করে নেব।

সূরাঃ আল-হুজুরাত, আয়াত ১৫ -

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।

সূরাঃ আত-তাহরীম, আয়াত ৯ -

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَـٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُيَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَـٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

'হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হও; আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!

কিতাল (সশস্ত্র সংগ্রাম)-এর অনুমতি ও ফরজিয়ত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ
(Permission and Obligation of Fighting)

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ১৯০-১৯৩ -

ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۝[١] إِنّsوَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۟[

আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ২১৬ -

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ২৪৪ -

وَقَـٰتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর এবং জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত ৭৪-৭৬ -

فَلْيُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْأَخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।’

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓاْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।

সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত ৮৪ -

فَقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً

অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর। তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। আশা করা যায় আল্লাহ অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর।

সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত ৮৯ -

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

তারা কামনা করে, যদি তোমরা কুফরী করতে যেভাবে তারা কুফরী করেছে। অতঃপর তোমরা সমান হয়ে যেতে। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। অতএব তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। আর তাদের কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না এবং না সাহায্যকারীরূপে।

সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত ৯১ -

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا

তোমরা অচিরেই অন্য লোককে পাবে, যারা তোমাদের কাছে নিরাপত্তা চাইবে এবং নিরাপত্তা চাইবে তাদের কওমের কাছে। যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে ফিরানো হয়, তারা সেখানে ফিরে যায়। সুতরাং যদি তারা তোমাদের থেকে সরে না যায় এবং তোমাদের কাছে সন্ধি প্রস্তাব উপস্থাপন না করে এবং নিজদের হাত গুটিয়ে না নেয়, তাহলে তাদেরকে পাকড়াও করবে এবং হত্যা করবে যেখানেই তাদের নাগাল পাবে। আর ওরাই তারা, যাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ক্ষমতা দিয়েছি।

হাদিসে জিহাদ (Jihad in the Hadith)

ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হলো হাদিস শরীফ। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, কর্ম এবং অনুমোদনের মাধ্যমে জিহাদের পরিধি, এর প্রকারভেদ এবং এর আত্মিক ও সামাজিক গুরুত্ব স্পষ্টভাবে উম্মতের সামনে প্রতিভাত হয়েছে

জিহাদ ওয়াজিব এবং তাতে সকাল-সন্ধ্যার মাহাত্ম্য

وَعَنِ ابنِ مَسعُود رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا» قُلْتُ: ثُمَّ أيُّ ؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ». متفقٌ عَلَيْهِ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহর নিকট কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়?' তিনি বললেন, "যথা সময়ে নামায আদায় করা।" আমি নিবেদন করলাম, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, "মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" আমি আবার নিবেদন করলাম, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" (বুখারী ও মুসলিম) [সহীহুল বুখারী ৫২৭, ২৭৮২, ৫৯৭০, ৭৫৩৮, মুসলিম ৮৫]

وَعَنْ أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَيُّ العَمَلِ أَفْضلُ ؟ قَالَ: «الإِيمَانُ بِاللهِ، وَالجِهَادُ في سَبِيلِهِ

আবূ জর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা।" [সহীহুল বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ৮৪]

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর পথে এক সকাল বা এক সন্ধ্যা অতিক্রান্ত করা, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম। [সহীহুল বুখারী ২৭৯২, ২৭৯৬, ৬৫৬৮, মুসলিম ১৮৮০]

وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مُؤْمنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبيلِ اللهِ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে এই নিবেদন করল যে, 'সব চাইতে উত্তম ব্যক্তি কে?' তিনি বললেন, "সেই মুমিন ব্যক্তি, যে নিজ জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে।" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "সেই মুমিন, যে পার্বত্য ঘাঁটির মধ্যে কোন ঘাটিতে আল্লাহর ইবাদতে প্রবৃত্ত থাকে ও জনগণকে নিজের মন্দ থেকে মুক্ত রাখে। [সহীহুল বুখারী ২৭৮৬, ৬৪৯৪, মুসলিম ১৮৮৮]

وَعَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ المُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ فِتْنَةَ القَبْرِ

ফাযালা ইবনে উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রতিটি মৃত্যুগামী ব্যক্তির পরলোকগমনের পর তার কর্মধারা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা রত ব্যক্তির নয়। কেননা, তার আমল কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করা হবে এবং সে কবরের পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

[আবূ দাউদ ২৫০০, তিরমিযী ১৩২১]

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : «تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانٌ بِي، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ . وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِم ؛ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ، وَرِيحُهُ رِيحُ مِسْكٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى المُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبيلِ اللهِ أَبَداً، وَلكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي . وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبيلِ اللهِ، فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ সে ব্যক্তির (রক্ষণাবেক্ষণের) দায়ভার গ্রহণ করেন, যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় বের হয়। (আল্লাহ বলেন,) 'আমার পথে জিহাদ করার স্পৃহা, আমার প্রতি বিশ্বাস, আমার পয়গম্বরদেরকে সত্যজ্ঞানই তাকে (স্বগৃহ থেকে) বের করে। আমি তার এই দায়িত্ব নিই যে, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, না হয় তাকে নেকী বা

গনিমতের সম্পদ দিয়ে তার সেই বাড়ির দিকে ফিরিয়ে দেব, যে বাড়ি থেকে সে বের হয়েছিল।' সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ আছে! আল্লাহর পথে দেহে যে কোন জখম পৌঁছে, কিয়ামতের দিনে তা ঠিক এই অবস্থায় আগমন করবে যে, যেন আজই জখম হয়েছে। (টাটকা জখম ও রক্ত ঝরবে।)

তার রং তো রক্তের রং হবে, কিন্তু তার গন্ধ হবে কস্তুরীর মত। সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন আছে! যদি মুসলিমদের জন্য কষ্টের আশংকা না করতাম, তাহলে আমি কখনো এমন মুজাহিদ বাহিনীর পিছনে বসে থাকতাম না, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। কিন্তু আমার এ সঙ্গতি নেই যে, আমি তাদের সকলকে বাহন দিই এবং তাদেরও (সকলের জিহাদে বের হওয়ার) সঙ্গতি নেই। আর (আমি চলে গেলে) আমার পিছনে থেকে যাওয়া তাদের জন্য কষ্টকর হবে। সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন আছে! আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, আমি আল্লাহর পথে লড়াই করি এবং শহীদ হই। অতঃপর আবার (জীবিত হয়ে) লড়াই করি, পুনরায় শাহাদত বরণ করি। অতঃপর (পুনর্জীবিত হয়ে) যুদ্ধ করি এবং পুনরায় শহীদ হয়ে যাই।

সহীহুল বুখারী ৩১২৩, মুসলিম ১৮৭৬, ৩৬২৩৭, ২৭, ৮৭, ২৭৯৭, ২৮০৩, ২৯৭২, ৩১২৩, ৫৫৩৩, ৭২২৬, ৭২২৭, ৭৪৫৭, ৭৪৬৩

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشِعبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَة، فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَالَ: لَو اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لاَ تَفعَلْ؛ فَإِنَّ مُقامَ أَحَدِكُمْ في سَبيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً، أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ، وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةَ ؟ أُغْزُوا فِي سَبيلِ اللهِ، مَن قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবী একটি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সে পথে ছিল একটি ছোট মিষ্টি পানির ঝর্ণা। সুতরাং তা তাঁকে মুগ্ধ করে তুলল। তিনি বললেন, 'আমি যদি লোকদের থেকে পৃথক হয়ে এই পাহাড়ি পথে বসবাস করতাম, (তাহলে ভাল হত)! তবে এ কাজ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি ব্যতীত কখনই করব না।' সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, "এরূপ করো না। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের কোন ব্যক্তির (জিহাদ উপলক্ষে)

অবস্থান করা, নিজ ঘরে সত্তর বছর ব্যাপী নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান? অতএব আল্লাহর রাহে লড়াই কর। (জেনে রেখো,) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে দু'বার উটনী দোহানোর মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ জিহাদ করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে।" [তিরমিযী ১৬৫০, আহমাদ ১০৪০৭]

وَعَنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

উক্ত বর্ণনাকারী (আবূ হুরাইরা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতের মধ্যে একশ'টি স্তর আছে, যা আল্লাহর রাহে জিহাদ-কারীদের জন্য মহান আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন। দুই স্তরের মাঝখানের ব্যবধান আসমান-জমিনের মধ্যবর্তীর দূরত্ব-সম।" [সহীহুল বুখারী ২৭৯০, ৭৪২৩]

وَعَن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبّاً، وَبِالإِسْلاَمِ ديناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ»، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعيدٍ، فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللهُ بِهَا العَبْدَ مِئَةَ دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» قَالَ: وَمَا هيَ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، الجِهَادُ في سَبيلِ اللهِ

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব (প্রতিপালক) বলে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পয়গম্বর-রূপে মেনে নিলো, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল।" আবূ সাঈদ (বর্ণনাকারী) অনুরূপ উক্তি শুনে নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কথাগুলি আবার বলুন।' তিনি তাই করলেন। তারপর তিনি বললেন, "আরও একটি পুণ্যের সুসংবাদ, যার বিনিময়ে বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের মধ্যে একশ'টি স্তর উঁচু করে দেবেন, প্রতি দুই স্তরের মাঝখানের দূরত্ব হবে, আকাশ-পৃথিবীর মধ্যখানের দূরত্ব সম।" আবূ সাঈদ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! সেটি কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।" [মুসলিম ১৮৮৪]

وَعَن أَبي بَكْرِ بنِ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي رضي الله عنه، وَهُوَ بَحَضْرَةِ العَدُوِّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ

أَبْوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ» فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الهَيْئَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُم السَّلاَمَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى العَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ

আবূ বকর ইবনে আবূ মুসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এ কথা বলতে শুনেছি---যখন তিনি শত্রুর সামনে বিদ্যমান ছিলেন---আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিঃসন্দেহে জান্নাতের দ্বারসমূহ তরবারির ছায়াতলে রয়েছে।" এ কথা শুনে রুক্ষ বেশধারী জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'হে আবূ মুসা! আপনি কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল এবং বলল, তোমাদেরকে বিদায়ী সালাম জানাচ্ছি।' অতঃপর সে তার তরবারির খাপটি ভেঙ্গে দিয়ে (নগ্ন) তরবারিটি নিয়ে শত্রুর দিকে অগ্রসর হল এবং শত্রুকে আঘাত করে অবশেষে সে শহীদ হয়ে গেল। [মুসলিম ১৯০২]

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ». رواه الترمذي

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, "দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। আল্লাহর ভয়ে যে চক্ষু ক্রন্দন করে। আর যে চক্ষু আল্লাহর পথে প্রহরায় রত থাকে।" [তিরমিযী ১৬৩৯]

وَعَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

যায়দ ইবনে খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যোদ্ধা প্রস্তুত করে দিল, সে আসলে স্বয়ং যুদ্ধ করল। আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার পরিবারের দেখা-শুনা করার জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করল, সে আসলে স্বয়ং যুদ্ধ করল।" [সহীহুল বুখারী ২৮৪৩, মুসলিম ১৮৯৫]

وَعَن أَبي أُمَامَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : «أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنِيحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সর্বোত্তম সদকা আল্লাহর রাহে তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া, (যার দ্বারা মুজাহিদ উপকৃত হয়)। আর আল্লাহর রাস্তায় কোন খাদেম দান করা (যার দ্বারা মুজাহিদ সেবা গ্রহণ করে। কিংবা আল্লাহর পথে (গর্ভধারণের উপযুক্ত হৃষ্টপুষ্ট) উটনী দান করা, (যার দুধ দ্বারা মুজাহিদ উপকৃত হয়)।" [তিরমিযী ১৬২৭, আহমাদ ২৭৭৭২]

وَعَن أَنَسٍ رضي الله عنه:أَنَّ فَتَىً مِنْ أَسْلَمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجهَّزُ بِهِ، قَالَ: «اِئْتِ فُلاناً فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ» فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، ويَقُول: أَعْطِنِي الَّذِيْ تَجَهَّزْتَ بِهِ . قَالَ: يَا فُلاَنَةُ، أَعْطِيهِ الَّذِي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلاَ تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئاً، فَوَاللهِ لاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئاً فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আসলাম গোত্রের এক যুবক এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদ করতে চাচ্ছি; কিন্তু তার জন্য আমার কোন সাজ-সরঞ্জাম নেই।' তিনি বললেন, "তুমি অমুকের নিকট যাও। কারণ, সে (যুদ্ধের জন্য) সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছিল; কিন্তু (ভাগ্যক্রমে) সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।" সুতরাং সে তার কাছে এসে বলল, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে সালাম পেশ করেছেন এবং বলেছেন যে, তুমি আমাকে ঐসব সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে দাও, যা তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলে।' সে (স্বীয় স্ত্রীকে) বলল, 'হে অমুক! ওকে ঐ সমস্ত সরঞ্জাম দিয়ে দাও, যেগুলি আমি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করেছিলাম। আর ওর মধ্য হতে কোন কিছু রেখে নিও না (বরং সমস্ত দিয়ে দাও)। আল্লাহর শপথ! তুমি তার মধ্য হতে কোন জিনিস আটকে রাখলে, তোমার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না।' [মুসলিম ১৮৯৪]

وَعَن البَرَاءِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ: «أَسْلِمْ، ثُمَّ قَاتِلْ» . فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : «عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيراً

বারা' ইবনে আযেব কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট লোহার শিরস্ত্রাণ পরা মুখ ঢাকা অবস্থায় এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আগে জিহাদ করব, না ইসলাম গ্রহণ করব?' তিনি বললেন, "আগে ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর জিহাদ কর।" সুতরাং সে ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদে প্রবৃত্ত হল এবং শহীদ হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "লোকটি কাজ তো অল্প করল; কিন্তু পারিশ্রমিক প্রচুর পেল।" [সহীহুল বুখারী ২৮০৮, মুসলিম ১৯০০]

وَعَن أَبي قَتَادَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِيهِم فَذَكَرَ أَنَّ الجِهَادَ فِي سَبيلِ اللهِ، وَالإِيمَانَ بِاللهِ، أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ الله وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «كَيْفَ قُلْتَ ؟» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ، إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيهِ السَّلاَمُ - قَالَ لِي ذَلِكَ

আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনমন্ডলীর মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দানকালে বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও আল্লাহর পথে ঈমান রাখা সর্বোত্তম কর্ম।" জনৈক ব্যক্তি উঠে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন, যদি আমি আল্লাহর রাহে লড়াই করে শাহাদত বরণ করি, তাহলে কি আল্লাহ আমার সমুদয় পাপ-রাশিকে মিটিয়ে দেবেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, যদি তুমি আল্লাহর পথে নেকীর কামনায় ধৈর্য-সহ্যের সাথে অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদপসরণ না করে শহীদ হয়ে যাও, (তাহলে আল্লাহ তোমার সমস্ত পাপরাশি মাফ করে দেবেন।)"

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি কি যেন বললে?" সে বলল, 'আপনি বলুন, যদি আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার গুনাহ-খাতাসমূহ তার ফলে মিটে যাবে কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, “হ্যাঁ, ধৈর্য-সহ্যের সাথে, অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদপসরণ না করে (যদি তুমি শহীদ হয়ে যাও তাহলে)। কিন্তু ঋণ ছাড়া। যেহেতু জিবরীল (আঃ) এখনই আমাকে এ কথা বললেন।

** (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ না করার গোনাহ মাফ হবে না। কারণ এটি বান্দার হক। আর বান্দার হক বান্দার কাছেই ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

[মুসলিম ১৮৮৫, তিরমিযী ১৭১২]

وَعَن أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: اِنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا المُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ، وَجَاءَ المُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَقْدِمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ» . فَدَنَا المُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : «قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ» قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بن الحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّماوَاتُ وَالأَرْضُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: بَخٍ بَخٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَولِكَ بَخٍ بَخٍ ؟» قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا». فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَياةٌ طَوِيلَةٌ، فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সহচরবৃন্দের সাথে (বদরাভিমুখে) রওনা দিলেন। পরিশেষে মুশরিকদের পূর্বেই তাঁরা বদর স্থানে পৌঁছে গেলেন। তারপর মু-শরিকগণ সেখানে এসে পৌঁছল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা অবশ্যই কেউ কোন বিষয়ে আগে বেড়ে কিছু করবে না; যতক্ষণ আমি নির্দেশ না দেব অথবা আমি স্বয়ং তা করব।” সুতরাং যখন মুশরিকরা নিকটবর্তী হল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা সেই জান্নাতের দিকে ওঠো, যার প্রস্থ হল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সমান।”

বর্ণনাকারী বলেন, উমাইর ইবনে হুমাম আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিবেদন করলেন, ’হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের প্রস্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সমান?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” উমাইর বললেন, ’বাঃ বাঃ!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

“বাঃ বাঃ’ শব্দ উচ্চারণ করার জন্য তোমাকে কোন জিনিস উদ্বুদ্ধ করল?” উমাইর বললেন, ’আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল! তার (জান্নাতের) অধিবাসী হওয়ার কামনা ছাড়া আর কিছুই নয়।’ তিনি বললেন, “তুমি তার অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।”

অতঃপর তিনি কতিপয় খেজুর স্বীয় তূণ থেকে বের করে খেতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, ’যদি আমি এগুলি খেতে থাকি, তবে দীর্ঘক্ষণ জীবিত থাকতে হবে (এত দেরী সহ্য হবে না)।’ বিধায় তিনি তাঁর কাছে যত খেজুর ছিল, সব ফেলে দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে শহীদ হয়ে গেলেন। মুসলিম ১৯০১

وَعَنه، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُونَا القُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ: القُرَّاءُ، فِيهِم خَالِي حَرَامٌ، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالمَاءِ، فَيَضَعُونَهُ فِي المَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ، وَلِلفُقَرَاءِ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ، فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا المَكَانَ، فَقَالُوا: اَللهم بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا، وَأَتَى رَجُلٌ حَراماً خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ، فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ، فَقَالَ حَرَامٌ: فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اَللهم بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا

উক্ত রাবী (আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, কয়েকটি লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, ’আমাদের সঙ্গে কিছু শিক্ষিত মানুষ পাঠিয়ে দিন, যারা আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা দেবেন।’ সুতরাং তিনি সত্তর জন আনসারীকে পাঠিয়ে দিলেন--যাঁদেরকে ’কুররা’ (কুরআনের হাফেয) বলা হত। ’হারাম’ নামক আমার মামাও তাঁদের অন্যতম। তাঁরা রাতে কুরআন পড়তেন, আপোষে কুরআন অধ্যয়ন করতেন এবং শিক্ষা অর্জন করতেন। আর দিনে তাঁরা পানি এনে মসজিদে রাখতেন। কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করতেন এবং তা দিয়ে আহলে সুফ্ফা (মসজিদে নববীতে অবস্থানরত তৎকালীন ইসলামী ছাত্রবৃন্দ) ও গরীবদের জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে প্রেরণ করলেন। পথিমধ্যে তারা তাঁদেরকে আটকে তাঁদের গন্তব্য-স্থলে পৌঁছনোর পূর্বেই হত্যা করে দিল। শাহাদত প্রাক্কালে তাঁরা এই দো’আ করলেন,

“হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নবীকে এই সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমরা তোমার সাক্ষাৎ লাভ করেছি, অতঃপর তোমার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছ।” আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মামা ’হারাম’-এর পশ্চাৎ দিক থেকে একটি লোক এসে বল্লমের খোঁচা মেরে (শরীর ফুঁড়ে) পার করে দিল। হারাম বলে উঠলেন, ’কা’বার প্রভুর কসম! আমি সফল হলাম!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উপস্থিত সাহাবীদের সম্বোধন করে) বললেন, “নিঃসন্দেহে তোমাদের ভাইদেরকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে এবং তারা এ বলে দো’আ করেছে, ’হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নবীকে এই সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমরা তোমার সাক্ষাৎ লাভ করেছি, অতঃপর তোমার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছ।” [সহীহুল বুখারী ১০০১-১০০৩, ১৩০০, ২৮১৪, ২৮০১, ৩০৬৪, ৩১৭০, ৪০৮৮, ৪০৮৯, ৪০৯০, ৪০৯১, ৪০৯২, ৪০৯৩, ৪০৯৪, ৪০৯৫, ৪০৯৬, ৬৩৯৪, মুসলিম ৬৭৭]

জিহাদের শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য হাতিয়ার

ধৈর্য ও খোদাভীরুতা

আজ বিশ্বের মানুষ তার প্রতিপক্ষের উপর বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন রকমের হাতিয়ার এবং চেষ্টা প্রয়োগ করে। আর বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে তো হাতিয়ার আর কৌশলের কোন অভাব নেই। ইসলামও প্রয়োজনীয় জাগতিক সামগ্রী ও যুদ্ধোপকরণ তৈরী ও ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে (ইনশাআল্লাহ)। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, জাগতিক হাতিয়ার এবং কৌশলের ক্ষেত্রে অন্য জাতির উপর মুসলমানদের কোন বিশেষত্ব নেই এবং হতেও পারে না। বরং যেহেতু অমুসলিমরা সাধারণতঃ সকল মেধা, চিন্তা-চেতনা ও সর্বশক্তি জাগতিক হাতিয়ার প্রস্তুত ও ব্যবস্থার পিছনে ব্যয় করে। তাই তারা এ ব্যাপারে মুসলমানদের তুলনায় সর্বদা অগ্রসরই থাকবে। ইতিহাস এটাই সাক্ষ্য দেয়; তবে মুসলমানদের নিকট এমন অলৌকিক শক্তি রয়েছে যা অপ্রতিরোধ্য। কাফের গোষ্ঠী যার মোকাবেলা করতে অক্ষম। সেটা হল আল্লাহ তাআলার গায়েবী মদদ। এ খোদায়ী মদদ ও সাহায্য অর্জনের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যখনই মুসলমানরা এ সকল শর্ত পূরণ করবে তখনই আল্লাহ তাআলার মদদ ও সাহায্য আসবে। আর সংখ্যালঘু এবং স্বল্প অস্ত্রধারীদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অজস্র অস্ত্রধারীদের উপর বিজয়ী করে দেখিয়ে দেন।

আর যখন স্বয়ং মুসলমানরা সে সব শর্ত পূরণ করতে গাফলতী ও অলসতা প্রদর্শন করে তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য-সহযোগিতার কোন অঙ্গীকার থাকে না। নিজেদেরকে এসবের যোগ্য মনে না করাই উচিত। এতদসত্ত্বেও যদি আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার সাহায্য আসে তাহলে সেটা তার বিশেষ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা ছাড়া কিছুই নয়। যেমনটি ৬৫ সালে পাকিস্তানের উপর ভারতের আক্রমণের সময় পরিলক্ষিত হয়েছে। তখন আমরা সে সব শর্তের উপর কোন প্রকার আমলই করতে পারেনি, যদ্বারা আল্লাহ তাআলার সাহায্য আসতে পারে। কিন্তু তিনি স্বীয় করুণায় এক এক করে আমাদের অবস্থার উপর ইনকিলাব সৃষ্টি করে আমাদেরকে সবর ও তাকওয়ার নিকটতম করে দিয়েছেন এবং তাঁর সাহায্যের এমন মুজেযাসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, শত্রুরাও এর সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার মদদ লাভের শর্তাবলী কি, তা কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে :

-১يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ

১– "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" –সূরা বাকারা : ১৫৩, রুকু ১৯

-২وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

২– "রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী, এরাই সত্যাশ্রয়ী; আর তারাই পরহেযগার।" –সূরা বাকারা : ১৭৭, রুকু ২২

-৩وَقَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

৩– "(মুজাহিদরা) বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ, আমাদের সাহায্য কর কাফের জাতির বিরুদ্ধে।" –সূরা বাকারা : রুকু ৩৩

-৪وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

৪– "আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তাদের প্রতারণা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।" –সূরা আলে ইমরান : রুকু ১৩

-৫بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

৫– “নিঃসন্দেহে, যদি তোমরা ধৈর্য ও তাকওয়া অবলম্বন কর আর শত্রু তোমাদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে তাহলে তোমাদের প্রভু পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।” –সূরা আলে ইমরান : রুকু ১৩

–৬وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

৬– “যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর তবে তা হবে একান্ত সৎ সাহসের কাজ।” –সূরা আলে ইমরান : রুকু ৯

–৭يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৭– “হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর এবং ইবাদতে মনোনিবেশ কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” –সূরা আলে ইমরান

–৮وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

৮– “এবং মূসা তার কওমকে বলল, সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং সুপরিণতি মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।” –সূরা আরাফ : ১৫

–৯وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

৯– “আর পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমাদের পালনকর্তার নেক প্রতিশ্রুতি, বনী ইসরাঈলদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের দরুন। আর ধ্বংস করে দিয়েছি সে সবকিছু যা তৈরী করেছিল ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ তৈরী করেছিল।” - সূরা আরাফ: রুকু ১৬

-১০اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

১০- “নিশ্চয়ই সে সকল ব্যক্তি যারা ধৈর্য ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে আল্লাহ এমন নেককার লোকদের বিনিময় ধ্বংস করবেন না।” - সূরা ইউসুফ

উপরে কুরআন কারীমের দশটি আয়াত উদ্ধৃত হল। এগুলো তেলাওয়াত করা এবং বার বার গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করা উচিত। এতে মানুষের সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; বিশেষ করে জিহাদ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার গায়েবী মদদ, সাহায্য-সহযোগিতা ও বিজয় লাভের উপায় ও ব্যবস্থাপত্র বলে দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যবস্থাপত্রে যে কয়টি বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় তা হল- নামায, ধৈর্য ও তাকওয়া।

এই আয়াতসমূহের মধ্যে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে আল্লাহ তাআলার এটাই বিধান ছিল যে, এই মদদ ও সাহায্য-সহযোগিতা সে সব লোকদের ভাগ্যেই জুটে যারা ঈমানের সাথে নামায, ধৈর্য ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে। নামাযের অর্থ এবং এর গুরুত্ব কমবেশী সকল মুসলমানই জানে। সুতরাং এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

'صبر' (সবর) আরবী শব্দ। আমাদের পারিভাষিক অর্থের তুলনায় আরবী ভাষায় এর অর্থের ব্যাপকতা অধিক।

আরবী ভাষায় 'সবর'-এর সাধারণ অর্থ হল, নফসকে বিরত রাখা। আর কুরআনে কারীমের পরিভাষায় নফসকে তার কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখা এবং আয়ত্বে রেখে দৃঢ়পদ থাকার নাম সবর।

আর تقوى (তাকওয়া) অর্থ খোদভীতি। অন্য অর্থে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের নাম তাকওয়া।

ইসলামী ইতিহাসের প্রথম শতাব্দীতে যে সকল বস্তু মুসলমানদের রীতিনীতি ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণ ছিল তা হল নামায, সবর ও তাকওয়া। এর ফলশ্রুতিতেই আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং জিহাদের ময়দানে প্রকাশ্য বিজয় ও সফলতা দান করেছেন। আজও যদি আমরা তা অবলম্বন করি তাহলে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর ফেরেশতাকুলের মদদ থেকে আমরা বঞ্চিত হব না। প্রকৃত কথা এই:

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

"বদরের পরিবেশ তৈরী কর, আকাশ থেকে এখনও দলে দলে ফেরেশতা তোমার মদদে অবতীর্ণ হতে পারে।"

জিহাদের প্রস্তুতি এবং জিহাদের হাতিয়ারের ব্যবস্থা করাও ফরয

সবর ও তাকওয়া এবং আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান ও ভরসা তো মুসলমানদের মূল ও দুর্দমনীয় শক্তি। তার সাথে এ-ও আবশ্যক যে, প্রত্যেক যুগোপযোগী ও স্থান ভেদে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা।

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

ۡوَاَعِدُّوۡا لَهُمۡ مَّا اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ قُوَّةٍ وَّمِنۡ رِّبَاطِ الۡخَيۡلِ تُرۡهِبُوۡنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُم

“আর প্রস্তুত কর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালন কর ঘোড়া, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর।” -সূরা আনফাল

রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা জিহাদের জন্য শরীর চর্চা ও অনুশীলনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। সে যুগে যুদ্ধের যে সকল সরঞ্জাম ছিল সেগুলো সংগ্রহ করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন। জিহাদের জন্য ঘোড়া, উট, লৌহবর্ম ও যুদ্ধ পোশাক ইত্যাদি সংগ্রহ করেছেন। তীরনিক্ষেপ ও হাতের নিশানা ঠিক করার প্রশিক্ষণেরও নির্দেশ দিয়েছেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যুদ্ধাস্ত্র কারিগরি শিক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন

হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) ‘আল-বিদায়া ওয়ান্নিহায়া’ নামক ইতিহাস গ্রন্থে লিখেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুজন সাহাবী হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ ও গাইলান ইবনে আসলাম (রাঃ) এক জিহাদে নবীজীর সাথে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ তারা কিছু যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর পদ্ধতি শিখতে দামেস্কের প্রসিদ্ধ শিল্প শহর ‘হায়রাশ’-এ গিয়েছিলেন। যেহেতু সেখানে দাব্বাবা ও যব্বুর নামের বড় বড় গাড়ি তৈরী করা হত যা বর্তমানে ট্যাংকের ন্যায় উপকারে আসত। এমনিভাবে মিনজানীক্বের কারিগরিও সেখানে ছিল যারা ভারী-ভারী পাথর নিক্ষেপ করে দূর্গ ভাঙ্গতে কামানের কাজ নেওয়া হত। এই সকল কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য সে সকল সম্মানী ব্যক্তিগণ সিরিয়া গিয়েছিলেন।

এ ঘটনা দ্বারা এটি প্রমাণিত হল যে, মুসলমানদের জন্য জরুরী হল, তারা নিজেদের হাতিয়ার ও যুদ্ধাস্ট্রে স্বনির্ভর হবে; অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না। কেননা, তাঁদের পক্ষে সে দেশ থেকে এসব গাড়ী ও মিনজানীক্ব ক্রয় করে আনাও সম্ভব ছিল; কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তা করেননি; বরং তৈরী করার যোগ্যতা অর্জন করে নিজ দেশে তা তৈরীর ব্যবস্থা করেছেন। আমাদেরও কর্তব্য হল এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো রূহানী ও খোদা প্রদত্ত মদদ ছিল; জাগতিক কোন হাতিয়ারের প্রয়োজনই ছিল না। এতদসত্ত্বেও তিনি হাতিয়ার তৈরীর এত গুরুত্বারোপ করেছেন। এমতাবস্থায় আমাদের মত দুর্বল ঈমানদার ও গুনাহগার লোকদের এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু হওয়া দরকার তা সহজেই অনুমেয়। বর্তমান যুগে যুদ্ধের জন্য যত রকমের হাতিয়ার, সরঞ্জামাদি ও মারণাস্ত্রের প্রয়োজন তার কোন

কিছু থেকেই পিছপা না হওয়া উচিত। আর এর সাথে সাথে কৌশলের মাঝে লেগে যাওয়া উচিত, যেন অতি শীঘ্রই সেগুলো নিজ দেশে তৈরী করা যায় এবং নিজ দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা যায়। (আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দিন।)

রিবাত তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত সংরক্ষণ

জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর একটি কাজ হল ইসলামী সীমান্তগুলো শত্রুর আক্রমণ থেকে হিফাযত করা; এটিকে কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের পরিভাষায় رباط (রিবাত) বলা হয়। আর জিহাদের মত এ কাজেও বড় ফযীলত রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাআত এই কাজকে অন্যান্য কাজসমূহের উপর প্রাধান্য দিয়ে সীমান্ত পাহারায় নিযুক্ত থেকেছেন।

আজকাল এই কাজের আঞ্জাম পুলিশ, বিডিআর'রা দিচ্ছে। যদি নিয়তের মধ্যে ইখলাস এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অনুভূতি থাকে তবে বেতন নেওয়া সত্ত্বেও তারা رباط (রিবাত) এর সওয়াব পাবে।

সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "একদিন আল্লাহর তাআলার রাস্তায় সীমান্ত পাহারা এক মাস রোযা রাখা ও রাত্রি জাগরণ অপেক্ষা উত্তম। আর যদি এ অবস্থায়ই সে ইন্তেকাল করে তবে যে নেক আমল সে জীবিত অবস্থায় করত তা মৃত্যুর পরও আমল নামায় একাধারে লেখা হতে থাকবে এবং কবরের সওয়াল-জওয়াব ও আযাব থেকে মুক্তি পাবে।"

তবরানীর রেওয়ায়াতে এ-ও আছে যে, "এক ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন শহীদদের সাথে উঠানো হবে এবং কেয়ামতের ভয়াবহ আযাবের মধ্যেও সে নিরাপদে থাকবে।" — ফাতহুল কাদীর

'রিবাত' এর অর্থ ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেওয়া। আর বাহ্যতঃ এ-ই যে, এই কাজ একমাত্র সে স্থানেই হতে পারে যেটি ইসলামী দেশের শেষ সীমায় অবস্থিত।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যুদ্ধের কলাকৌশলের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে। কেননা, সর্বত্রই বিমানসেনা অবতরণ করতে পারে। বোমারু বিমানের সাহায্যে যে কোন স্থানে বোমা নিক্ষেপ করা যায়। তাই যে স্থানেই শত্রুর আক্রমণের আশংকা থাকে সেখানকার হেফাযতের দায়িত্বও এই সীমান্তপাহারার অন্তর্ভুক্ত হবে।

পূর্ববর্তী ফকীহ তথা ফিকহশাস্ত্রবিদগণও রিবাতের ব্যাপারে এমনটিই বলেছেন যে, "যে এলাকার উপর একবার শত্রুর হামলা হয় সে এলাকার হেফাযত চল্লিশ বছর পর্যন্ত রিবাতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত থাকে।" —ফাতহুল কাদীর : ৪/২৭৮

পাকিস্তানের অতীত যুদ্ধে সরগুদা, পেশোয়ার ও করাচী ইত্যাদি স্থানসমূহ যেখানে বিমান সেনাদের অবতরণের আশংকা হত এবং শত্রুদের বোমারু বিমান বোমা নিক্ষেপ করেছে সেগুলোর হেফাযত সর্বদা রিবাতের হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত।

এ এমনই এক জিহাদ যেখানে প্রত্যেক শহরবাসী নিজ শহর বা গ্রামে বসে থেকেও রিবাতের সওয়াব পেতে পারে। শর্ত হল ইখলাসের সাথে নিজ শহর এবং শহরবাসীদের হেফাযতের সংকল্প রাখা এবং সামর্থ অনুযায়ী কৌশল অবলম্বন করা।

অধ্যায় ৪: জিহাদের প্রকারভেদ (Types of Jihad)

৪.১ ভূমিকা

ইসলামে জিহাদ একটি বহুমাত্রিক ও বিস্তৃত ধারণা। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জিহাদকে শুধুমাত্র যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। বরং এটি এমন একটি সামগ্রিক সংগ্রাম, যার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, সত্য প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা। ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাসসির ও ফকীহগণ জিহাদের বিভিন্ন স্তর ও প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। এসব প্রকারভেদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত, কিছু সামাজিক এবং কিছু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর *যাদুল মাআদ* গ্রন্থে জিহাদকে মূলত চার ভাগে বিভক্ত করেছেন:

১. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ

২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ

৩. মুনাফিক ও বাতিল চিন্তার বিরুদ্ধে জিহাদ

৪. অস্ত্রধারী শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ

এই অধ্যায়ে জিহাদের প্রধান প্রধান প্রকারভেদ বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

৪.২ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ (جهاد النفس)

৪.২.১ পরিচয়

নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি বলা হয়। মানুষের ভেতরে এমন কিছু প্রবৃত্তি রয়েছে, যা তাকে পাপ, অবাধ্যতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে আহ্বান করে। এই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামই হলো জিহাদুন নফস।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
"যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে এবং প্রবৃত্তিকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, তার আবাস হবে জান্নাত।"
(সূরা আন-নাযিআত: ৪০-৪১)

৪.২.২ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের গুরুত্ব

মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু বাইরের শত্রু নয়; বরং তার নিজের ভেতরের কুপ্রবৃত্তি। লোভ, অহংকার, হিংসা, কামনা, রিয়া, কৃপণতা এবং ক্ষমতার মোহ মানুষের আত্মিক উন্নতির পথে প্রধান বাধা।

এ কারণে ইসলামী পণ্ডিতগণ নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সব ধরনের জিহাদের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

৪.২.৩ নফসের জিহাদের স্তরসমূহ

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) নফসের বিরুদ্ধে জিহাদকে চার স্তরে ভাগ করেছেন:

প্রথম স্তর

সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য সংগ্রাম।

দ্বিতীয় স্তর

অর্জিত জ্ঞানের ওপর আমল করা।

তৃতীয় স্তর

অন্যদের কাছে সে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া।

চতুর্থ স্তর

সত্যের পথে কষ্ট ও পরীক্ষার মোকাবিলা করা।

এই চার স্তর পূর্ণ না হলে একজন মুসলিমের ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা লাভ করে না।

৪.৩ শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ (جهاد الشيطان)

৪.৩.১ শয়তান মানুষের চিরশত্রু

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

“নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরাও তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর।” (সূরা ফাতির: ৬)

শয়তানের প্রধান কাজ হলো মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করা।

৪.৩.২ শয়তানের কৌশল

শয়তান সাধারণত চারটি উপায়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে:

১. কুফর ও শিরকের দিকে আহ্বান।

২. বিদআতের দিকে আহ্বান।

৩. কবীরা গুনাহের দিকে আহ্বান।

৪. ছোট গুনাহকে তুচ্ছ মনে করানো।

এই প্রলোভনের বিরুদ্ধে সচেতনতা এবং আত্মরক্ষা হলো শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ।

৪.৩.৩ শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের উপায়

- কুরআন তিলাওয়াত
- যিকির
- সালাত
- তাকওয়া
- ইসলামী জ্ঞান অর্জন
- সৎ সঙ্গ গ্রহণ

এসব আমল শয়তানের ষড়যন্ত্র মোকাবিলার কার্যকর মাধ্যম।

৪.৪ জ্ঞান ও দাওয়াহ দ্বারা জিহাদ (جهاد العلم والدعوة)

৪.৪.১ ইসলামে জ্ঞানের মর্যাদা

ইসলামের প্রথম ওহীই ছিল—

اقْرَأْ

“পড়ো।”

(সূরা আল-আলাক: ১)

এ থেকেই বোঝা যায় যে জ্ঞান অর্জন ইসলামী সভ্যতার মৌলিক ভিত্তি।

৪.৪.২ কুরআনের মাধ্যমে জিহাদ

আল্লাহ বলেন:

وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

"তুমি কুরআনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে মহান জিহাদ পরিচালনা কর।"

(সূরা আল-ফুরকান: ৫২)

এ আয়াত মক্কী যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল।

অর্থাৎ—

- কলম দ্বারা জিহাদ
- জ্ঞান দ্বারা জিহাদ
- যুক্তি দ্বারা জিহাদ
- দাওয়াহ দ্বারা জিহাদ

সবই ইসলামী জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

৪.৪.৩ আধুনিক যুগে জ্ঞানভিত্তিক জিহাদ

বর্তমান যুগে মুসলিমদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর একটি হলো জ্ঞানভিত্তিক জিহাদ।

উদাহরণ:

- গবেষণা
- শিক্ষা বিস্তার
- ইসলামের ভুল ব্যাখ্যার জবাব
- একাডেমিক লেখালেখি
- মিডিয়ায় সত্য উপস্থাপন

এগুলো আধুনিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ।

৪.৫ সামাজিক সংস্কারমূলক জিহাদ

৪.৫.১ অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده

"তোমাদের কেউ কোনো অন্যায় দেখলে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে।"

(সহীহ মুসলিম)

এ হাদিস সমাজ সংস্কারের দায়িত্বকে নির্দেশ করে।

৪.৫.২ সামাজিক জিহাদের ক্ষেত্রসমূহ

- দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
- দারিদ্র্য দূরীকরণ
- শিক্ষার প্রসার
- মাদকবিরোধী কার্যক্রম
- মানবাধিকার রক্ষা

এসব কর্মকাণ্ডও ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৪.৬ অর্থনৈতিক জিহাদ (الجهاد بالمال)

৪.৬.১ সম্পদের মাধ্যমে জিহাদ

কুরআনে বহুবার "অর্থ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ" কথাটি এসেছে।

আল্লাহ বলেন:

ْجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُم

"তোমরা তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ কর।"

(সূরা আত-তাওবা: ৪১)

৪.৬.২ অর্থনৈতিক জিহাদের গুরুত্ব

অনেক ক্ষেত্রে সম্পদ দ্বারা সহযোগিতা সরাসরি যুদ্ধের চেয়েও বেশি কার্যকর হতে পারে।

উদাহরণ:

- এতিমদের সহায়তা
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা
- ইসলামী গবেষণায় অর্থায়ন
- মানবিক সাহায্য
- দাওয়াহ কার্যক্রম

৪.৭ সত্য কথা বলার জিহাদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

"অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।"

(সুনান আবু দাউদ)

এটি ইসলামের রাজনৈতিক নৈতিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

এখানে জিহাদ মানে:

- নৈতিক সাহস
- সত্যবাদিতা
- অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

জিহাদে আকবর কিসের নাম?

যারা "জিহাদ মা'আল কুফফার" ও ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ"র গুরুত্বকে খাটো করার জন্য জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ) ও জিহাদে আসগরের (ছোট জিহাদ) দর্শন ব্যবহার করেন। তাদের বক্তব্য হল, নফসের (প্রবৃত্তি) বিরুদ্ধে জিহাদই বড় জিহাদ এবং ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ হল ছোট জিহাদ!

এই ভুল ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার পরিবর্তে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (রহঃ)-এর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। হযরত বলেন-

"আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, কাফেরদের সাথে লড়াই করা জিহাদে আসগর (ছোট জিহাদ) এবং নফসের মুজাহাদা (কুপ্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি) জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ)। যেন তারা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে কাফেরদের সাথে লড়াই করাকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে।

এই ধারণা ঠিক নয় বরং বাস্তব কথা হল, কাফেরদের সাথে লড়াই করা ইখলাস শূন্য হলে বাস্তবিকভাবেই তা নফসের মুজাহাদা থেকে নিম্নস্তরের কাজ। এ ধরনের লড়াইকেই জিহাদে আসগর এবং এর বিপরীতে নফসের মুজাহাদাকে জিহাদে আকবর বলা হয়েছে।

কিন্তু কাফেরদের সাথে লড়াই যদি ইখলাসপূর্ণ হয় তবে এই লড়াইকে জিহাদে আসগর বলা গাইরে মুহাক্কিক (অগভীর জ্ঞানের অধিকারী) সুফীদের বাড়াবাড়ি বরং এই লড়াই

অবশ্যই জিহাদে আকবর এবং তা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে উত্তম। কেননা যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং এতে উভয় জিহাদের ফযীলতই একত্রিত হচ্ছে।
(আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ খঃ ৪, হিস্সা ৫ পৃঃ ৮২ মালফূয, ১০৪১)

৪.৮ সশস্ত্র জিহাদ (الجهاد القتالي)

৪.৮.১ পরিচয়

ইসলামী শরীয়তে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে:

- আল্লাহর কলিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে
- আত্মরক্ষার জন্য
- নির্যাতিতদের রক্ষার জন্য
- চরম আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য

৪.৮.২ সশস্ত্র জিহাদের শর্ত

সশস্ত্র জিহাদের জন্য কয়েকটি মৌলিক শর্ত রয়েছে:

১. বৈধ কর্তৃপক্ষ

কিছু কিছু ফকীহগণের মতে সাধারণত রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অনুমতি প্রয়োজন।

২. ন্যায়সঙ্গত কারণ

ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা ক্ষমতার লোভ বৈধ কারণ নয়।

৩. নিরপরাধদের নিরাপত্তা

নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অযোদ্ধাদের হত্যা নিষিদ্ধ।

৪. সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ

অত্যাচার ও বর্বরতা হারাম।

৪.৮.৩ যুদ্ধ ও জিহাদের পার্থক্য

সব যুদ্ধ জিহাদ নয়।

কোনো যুদ্ধ তখনই জিহাদ হবে যখন:

- উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি

- পদ্ধতি শরীয়তসম্মত
- নৈতিক সীমা রক্ষা করা হয়

অন্যথায় তা কেবল রাজনৈতিক বা সামরিক সংঘাত।

৪.৯ জিহাদের বিভিন্ন স্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক

জিহাদের সব স্তর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

একজন মুসলিমের জন্য:

১. নফসের জিহাদ

২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ

৩. জ্ঞানার্জনের জিহাদ

৪. দাওয়াহর জিহাদ

৫. সামাজিক সংস্কারের জিহাদ

৬. সম্পদের জিহাদ

৭. সশস্ত্র জিহাদ

—এগুলো একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

ইখলাস ছাড়া অন্য কোনো জিহাদ পূর্ণতা পায় না।

জিহাদ-এর বিষয়টি আলোচনা করতে আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হচ্ছে।

জিহাদ একটি মহান দায়িত্ব, যা কষ্ট ও প্রতিকূলতা নিয়ে আসা সত্ত্বেও প্রকৃত মুমিনদের অন্তরের অত্যন্ত প্রিয়। কারণ আল্লাহর ইচ্ছায় এটি তাদের এই দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে মুক্তি দিয়ে সম্মান ও মর্যাদার দিকে এবং পরাজয় থেকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। পরকালেও এটি তাদের জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সাহায্য করবে:

"কাউকে যদি জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখা হয় এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়, তবে সে-ই সফলকাম হলো। আর এই পার্থিব জীবন তো এক মায়াময় ভোগ-বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়।" [সূরা আল-ইমরান (৩), আয়াত: ১৮৫]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

**"আল্লাহর পথে যুদ্ধের ধুলোবালি এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো কোনো বান্দার ওপর একত্রিত হবে না।"

**"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি উট দোয়ানোর মধ্যবর্তী সময়টুকুও লড়াই করবে, তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যাবে।"

"আল্লাহর পথে [লড়াই করতে গিয়ে] যার দুই পা ধূলিধূসরিত হবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।"

এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কিছু সাহাবী যখন তাদের দারিদ্র্যের কারণে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে পারছিলেন না, তখন তারা কেঁদেছিলেন:

"তারা ফিরে গেল, আর তাদের চোখ দিয়ে দুঃখের অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল এ কারণে যে, তারা [জিহাদের জন্য] ব্যয় করার মতো কিছুই পাচ্ছিল না।" [সূরা আত-তাওবাহ (৯), আয়াত: ৯২]

তবুও, বর্তমান সময়ে এই **জিহাদই** মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কেউ একজন একে যথার্থই 'বিস্মৃত বাধ্যবাধকতা' (The Forgotten Obligation) বলে অভিহিত করেছেন। এটি বর্তমান সময়ের আমাদের সাথে আমাদের **উম্মাহর** প্রথম প্রজন্মের মধ্যকার বিশাল ব্যবধানকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে। এটি আরও ব্যাখ্যা করে যে, কেন আল্লাহ তাঁদের এতোটা সম্মানিত করেছিলেন এবং কেন তিনি আমাদের লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের অতল গহ্বরে পতিত হতে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত যথার্থই বলেছেন:

"যখন মানুষ দিনার ও দিরহামের প্রতি কৃপণ হয়ে পড়বে, তুচ্ছ জিনিসের ব্যবসায় লিপ্ত হবে এবং কৃষিকাজে মগ্ন হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর এমন বিপদ বা মুসিবত অবতীর্ণ করবেন যা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের দ্বীনের পথে ফিরে আসবে।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা ইতিপূর্বেই ঘটে গেছে। মানুষ তাদের জীবন ও সম্পদকে আল্লাহর (SWT) সমীপে পেশ করার জন্য অতি মূল্যবান মনে করতে শুরু করেছে। অথচ তিনি তাদের কাছ থেকে এগুলো কিনে নেওয়ার বিনিময়ে এক মহান পুরস্কারের প্রস্তাব দিয়েছেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে এসবই তাঁর নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পদ:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত..."

তিনি তাদের সেই বাজারের পথও দেখিয়েছেন যেখানে তারা এই লাভজনক সওদা করতে পারে:

"...তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। তারা মারে এবং মরে।"

তিনি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন:

"...এটি এমন এক প্রতিশ্রুতি যা তিনি নিজের ওপর অনিবার্য করে নিয়েছেন..."

তিনি তাঁর রাসূলগণের নিকট প্রেরিত অত্যন্ত মহিমান্বিত কিতাবসমূহেও এই প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন:

"...তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআনে। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে?"

তিনি তাদের এই চুক্তির মাধ্যমে আনন্দিত হওয়ার সুসংবাদও দিয়েছেন যা তারা তাঁর সাথে সম্পাদন করেছে:

"...অতএব, তোমরা যে সওদা করেছ তার জন্য আনন্দিত হও।"

এর কারণ হলো:

"...সেটিই হলো মহা সাফল্য।" [সূরা আত-তাওবাহ (৯), আয়াত: ১১১]

এটি একজন বান্দার জন্য নিশ্চিতভাবেই এক বিরাট সাফল্য যে, সে এমন সম্পদ পেশ করছে যা তার নয় এবং যার ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, আর তার বিনিময়ে সে এমন এক জান্নাত পাচ্ছে যা আসমান ও জমিনের সমান প্রশস্ত। এমন এক জান্নাত যেখানে কেউ কেবল তার নেক আমলের মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারবে না। আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

"আমল করো, (আল্লাহর) নিকটবর্তী হও এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো; কারণ কেউ কেবল তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল: "আপনিও কি নন, হে আল্লাহর রাসূল?" তিনি উত্তর দিলেন: **"আমিও না, যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত দিয়ে আবৃত করে নেন।"**[82]

অধিকন্তু, আল্লাহ সেই সব মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু যারা এই সওদা গ্রহণ করেছেন; তিনি তাদের পরিশোধিত মূল্য তাদের ফিরিয়ে দেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুত পুরস্কারও প্রদান করেন:

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের রবের নিকট থেকে রিজিক প্রাপ্ত হয়।" [সূরা আল-ইমরান (৩), আয়াত: ১৬৯]

এখানে "Screenshot 2026-06-15 at 2.00.07 AM.jpg" ফাইলটিতে থাকা লেখার একটি মার্জিত ও পেশাদার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো:

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির দেহের ভেতরে অবস্থান করে, যা আরশ থেকে ঝুলন্ত ঝাড়বাতিগুলোতে আশ্রয় নেয় এবং জান্নাতের যেখানে ইচ্ছে উড়ে বেড়ায়।"[83]

এবং এইভাবেই, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ (SWT) তাঁর মহানুভবতা ও করুণায় যারা এই সওদা গ্রহণ করেছিলেন, তাদের জীবন ও সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং অধিকন্তু, তাদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন। এতদসত্ত্বেও, বর্তমান যুগের মুসলিমরা এই মহান দায়িত্বকে অবহেলা করে, এই পরম সাফল্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং এই দ্বীনের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করতে অস্বীকার করে, আর "এর (ইসলামের) সর্বোচ্চ চূড়া হলো জিহাদ।"[84] আল্লাহ (SWT) বলেন (যার অর্থ):

"তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়; কিন্তু এমনও হতে পারে যে, কোনো একটি বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আবার এমনও হতে পারে যে, কোনো একটি বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না।" [সূরা আল-বাকারাহ (২), আয়াত: ২১৬]

বর্তমানে মানুষ **জিহাদকে** ঘৃণা করতে শুরু করায় এবং ফলশ্রুতিতে এটি এড়িয়ে চলায় এর বৈশিষ্ট্যসমূহ হারিয়ে গেছে, এর জ্ঞানসমূহ বিস্মৃত হয়েছে এবং মানুষের অন্তরে এর প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়েছে। এমনকি মানুষের অজ্ঞতা ও এর প্রতি ঘৃণার কারণে জিহাদের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি এই কারণে যে, **"তাদের ওপর সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, ফলে তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেছে।"** [সূরা আল-হাদিদ (৫৭), আয়াত: ১৬]

জিহাদ সম্পর্কে কথা বলা কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ এই পার্থিব জীবন আমাদের পিছন থেকে টেনে ধরে রাখছে; শয়তান আমাদের অন্তরে মিথ্যা আশা ও ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছে; কাপুরুষতা আমাদের মৃত্যুকে ভয় পেতে বাধ্য করেছে; এই জীবনের মায়াময় ভোগ-বিলাস এর পথে আমাদের জন্য একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়েছে; এবং এমনকি মানুষের আত্মা নিজেই এই দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যেতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, এবং বলছে (যার অর্থ):

"হে আমাদের রব! আপনি কেন আমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করলেন? আপনি যদি আমাদের আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিতেন!" [সূরা আন-নিসা (৪), আয়াত: ৭৭]

এর জবাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে অত্যন্ত সুন্দর একটি বাণী এসেছে (যার অর্থ):

"বলুন (হে মুহাম্মদ): এই দুনিয়ার ভোগ-বিলাস সামান্যই; আর যে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন করে, তার জন্য পরকালই উত্তম; এবং তোমাদের ওপর একটি খেজুরের আঁশের সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই—এমনকি তোমরা সুউচ্চ দুর্গে অবস্থান করলেও।" [সূরা আন-নিসা (৪), আয়াত: ৭৭-৭৮]

অতএব, আসুন আমরা এই দুনিয়ার সামান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে পিছনে ফেলে পরকালের জন্য কাজ করি, যা মুত্তাকীদের জন্য অনেক বেশি উত্তম। কেবল তখনই আমরা জিহাদকে ভালোবাসতে এবং এর জন্য আকুল হতে পারব, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ করেছিলেন। কেবল তখনই যখনই জিহাদের কথা উল্লেখ করা হবে, আমরা জান্নাতের সুবাস পাব। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "জান্নাত তলোয়ারের ছায়াতলে রয়েছে।"[85] কেবল তখনই আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করার বিষয়ে আলোচনা করতে পারি।

কিন্তু আমরা এই মহান দায়িত্বের আলোচনা কোথা থেকে শুরু করব? আমরা কি এর প্রকৃতি ও সারবত্তা নিয়ে আলোচনা শুরু করব? নাকি এর উদ্দেশ্য ও কারণসমূহ নিয়ে? নাকি এর পর্যায় ও অগ্রগতি নিয়ে? নাকি এর ঐতিহাসিক ও আইনি প্রয়োজনীয়তা নিয়ে? নাকি আমরা তাদের সম্পর্কে কথা বলা শুরু করব যারা জিহাদের সময়ে দুর্বল অজুহাত দেখিয়ে পিছনে রয়ে গিয়েছিল?

আসুন আমরা একেবারে শুরুতে ফিরে যাই—সেই দিনটিতে, যখন আমাদের নবী (ﷺ) প্রথম ওহী লাভ করেছিলেন।

ইবন আল-কাইয়্যিম বলেন, **"তাঁর প্রতিপালক তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী অবতীর্ণ করেছিলেন, তা ছিল তাঁর প্রতিপালকের নামে পড়ার নির্দেশ যিনি সৃষ্টি করেছেন। এটি তাঁর নবুয়তের মিশনের শুরুতে ঘটেছিল। অতএব, তাঁর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ছিল কেবল নিজের অন্তরে পড়া এবং যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা অন্যের কাছে প্রচার না করা। পরবর্তীকালে, আল্লাহ (SWT) এই আয়াত অবতীর্ণ করেন: 'হে চাদরাবৃত! ওঠো এবং সতর্ক করো!' "** [সূরা আল-মুদ্দাসসির (৭৪), আয়াত: ১-২]

সুতরাং, শুরুর দিকে নবী (ﷺ)-কে "পড়ো" শব্দের মাধ্যমে একজন নবী হিসেবে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে জানানো হয়েছিল, এরপর **"হে চাদরাবৃত! ওঠো এবং সতর্ক করো!"** বাণীর মাধ্যমে একজন রাসূল হিসেবে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। আল্লাহ তখন তাঁকে প্রথমে তাঁর নিকটাত্মীয়দের, তারপর তাঁর গোত্রকে, এরপর আশেপাশের আরবদের, অতঃপর সমগ্র আরববাসীকে এবং সবশেষে মানব ও জিন জাতিকে সতর্ক করার নির্দেশ দেন।

মুহাম্মদ (ﷺ) এরপর তাঁর নবুয়তের মিশনের প্রথম দশ বছর বা তার কাছাকাছি সময় **জিহাদ** বা **জিযয়া** (কর)-এর আশ্রয় না নিয়ে দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের কাজে ব্যয় করেন; কারণ তাঁকে নিজের হাত গুটিয়ে রাখার এবং যারা তাঁর ক্ষতি সাধন করেছিল তাদের সহ্য করার ও ক্ষমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরপর তাঁকে হিজরত করার এবং যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তাঁকে প্রথমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কেবল তাদের সাথেই যুদ্ধ করতে যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং যারা যুদ্ধ করেনি তাদের ছেড়ে দিতে। পরবর্তীতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয় **মুশরিকদের** বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না সমস্ত দ্বীন আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়।

জিহাদের নির্দেশ আসার পর, কাফেররা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: যাদের সাথে মুসলিমদের শান্তি চুক্তি ছিল (**আহলুস্-সুলহ ওয়াল-হুদনাহ**), যাদের সাথে তারা যুদ্ধাবস্থায় ছিল (**আহলুল হারব**), এবং সেইসব অমুসলিম যারা জিযয়া প্রদানের বিনিময়ে ইসলামী সরকারের নিরাপত্তায় বসবাস করছিল (**আহলুদ্ব-দ্বিম্মাহ**)। নবী (ﷺ)-কে প্রথম শ্রেণীর সাথে তাঁর কৃত চুক্তিগুলো পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যতদিন তারা সেই চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলে। কিন্তু, যে ক্ষেত্রে তিনি তাদের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করতেন বা এর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেতেন, সে ক্ষেত্রে তিনি চুক্তি বাতিল করতে, তাদের চুক্তি সমাপ্তির নোটিশ দিতে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হতে স্বাধীন ছিলেন। নবী (ﷺ)-কে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যারা তাঁর সাথে চুক্তির পর তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল। সূরা আত-তাওবাহ (সূরা নং ৯) অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে এই সমস্ত শ্রেণীর বিষয়ে **শরীয়তের** অবস্থান বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে আহলে কিতাবদের (খ্রিস্টান ও ইহুদি) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, যতক্ষণ না তারা জিযয়া প্রদান করে অথবা ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁকে কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল।

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হতো তরবারি দ্বারা এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হতো যুক্তি ও বাকশক্তির মাধ্যমে। নবী (ﷺ)-কে **আহলুল-'আহদ**-কে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল:

(১) যারা চুক্তির পর তাদের কসম ভঙ্গ করেছিল এবং তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেনি। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং এদের ওপর বিজয়ী হওয়ার নির্দেশ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

(২) যাদের সাথে তিনি সাময়িক চুক্তি করেছিলেন এবং যারা পরবর্তীতে কোনো বিষয়ে তাঁর সাথে খেয়ানত করেনি, কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি। এদের সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করার নির্দেশ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

(৩) যাদের সাথে তাঁর কোনো চুক্তি ছিল না এবং যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেনি, অথবা যাদের সাথে তাঁর স্থায়ী চুক্তি ছিল। এদেরকে চার মাসের অবকাশ দেওয়ার নির্দেশ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, যার পর তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। তদনুযায়ী, যারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং যাদের সাথে কোনো চুক্তি ছিল না তাদের চার মাসের অবকাশ দেন। আর তিনি তাদের চুক্তি রক্ষা করেছিলেন যাদের সাথে মেয়াদের শেষ পর্যন্ত তাঁর চুক্তি ছিল। তবে তারা সবাই মেয়াদের শেষ হওয়ার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আহলে কিতাবদের কাছ থেকেও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আক্রমণ বা নির্যাতনের ভয় ছাড়াই তাদের ধর্ম পালনের সুযোগ দেওয়ার বিনিময়ে **জিযয়া** দাবি করেছিলেন।

পুনরুল্লেখ করতে গেলে, সূরা তাওবাহ অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফেররা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল:

১. **আহলুল-হারব** (যারা তাঁর সাথে যুদ্ধাবস্থায় ছিল)। ২. **আহলুল-আহদ** (যাদের সাথে তাঁর চুক্তি ছিল)। ৩. **আহলুদ্ব-দ্বিম্মাহ** (আহলে কিতাব সম্প্রদায় যারা মুসলিমদের দেওয়া নিরাপত্তার বিনিময়ে জিযয়া প্রদান করত)।

যখন দ্বিতীয় দলটি ইসলাম গ্রহণ করল, তখন কেবল যারা তাঁর সাথে যুদ্ধাবস্থায় ছিল এবং আহলুদ্ব-দ্বিম্মাহরাই তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে অবশিষ্ট রইল।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, ইসলাম এসেছিল সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করতে:

"বলুন: হে মানুষ! আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি, আসমান ও জমিনের রাজত্ব যাঁর; তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।" [সূরা আল-আরাফ (৭), আয়াত: ১৫৮]

এটি পৃথিবীর বুক থেকে সব ধরনের **শিরক** নিশ্চিহ্ন করতেও এসেছিল, যাতে কেবল অংশীদারহীন এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আমি কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে তলোয়ারসহ প্রেরিত হয়েছি যতক্ষণ না অংশীদারহীনভাবে কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়।" এটি অর্জনের লক্ষ্যে মক্কায় রাসূলের আহ্বান ছিল: **"বলো, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহ নেই"**:

"বলুন: হে মানবজাতি! আমি তোমাদের জন্য কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।" [সূরা আল-হজ্জ (২২), আয়াত: ৪৯]

এই লক্ষ্যে মুসলিম বাহিনী মদীনা থেকে আরব উপদ্বীপের চারদিকে এবং সেখান থেকে রোম ও পারস্য অভিমুখে যাত্রা করেছিল। খিলাফতের প্রতিটি রাজধানী থেকে মুসলিম সেনাবাহিনী বের হতে থাকে, যারা তেরো শতাব্দী ধরে মদীনা থেকে দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো এবং অবশেষে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। 'সত্যের অশ্বারোহী দল' (The Battalions of Truth) সারা বিশ্বে ইসলামের পতাকা বহন করে নিয়ে গিয়েছিল।

এই সমস্ত **দাওয়াহ** কার্যক্রমে মুসলিমদের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, মক্কায় ইসলাম প্রচারের সময় এবং পরবর্তীতে কাবার চারপাশের মূর্তিসমূহ ধ্বংস করার সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর লক্ষ্য যা ছিল, তা-ই ছিল। সেই একই উদ্দেশ্য মুসলিম বাহিনীকে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মুসলিম সৈনিক রাবঈ বিন আমের এই লক্ষ্যটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছিলেন যখন পারস্য সেনাপতি রুস্তম তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, **"তোমরা কেন এসেছ?"** রাবঈ উত্তর দিয়েছিলেন, **"নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার ইবাদতের দিকে নিয়ে আসতে; মানবরচিত ধর্মের অবিচার থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে এবং এই দুনিয়ার সংকীর্ণতা ও কষ্ট থেকে পরকালের প্রশস্ততা ও শান্তিতে নিয়ে যেতে।"** প্রকৃতপক্ষে, এটিই সর্বদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীগণের লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্য কখনো পরিবর্তিত হয়নি, তবে আল্লাহর নির্দেশে এতে পৌঁছানোর উপায় ও পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে যাতে তা নতুন নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খায় যেখানে নতুন রূপে **দাওয়াহ** স্থিতি লাভ করেছিল। এটি তাঁর রাসূলের প্রতি আল্লাহর ওহী এবং

তাঁকে দেওয়া সুনির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত নির্দেশনার ফলেই সম্ভব হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন গোপনে **দাওয়াহ** বা দ্বীনের প্রচারের মাধ্যমে, যেখানে তিনি ইসলামের শিক্ষাসমূহ কেবল তাঁর নিকটতমদের কাছে পৌঁছে দিতেন যাদের সম্পর্কে তিনি অনুভব করতেন যে তারা আল্লাহর আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দেবে। অতঃপর, তিন বছর পর, তাঁকে প্রকাশ্যে প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়, যা তিনি মক্কা ও অন্যান্য স্থানে করেছিলেন। এই পর্যায়টি দশ বছর স্থায়ী হয়েছিল, যে সময়ে নবী (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীগণকে ধৈর্য সহকারে সেইসব কষ্ট ও প্রতিকূলতা সহ্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যা তাঁদের ওপর এবং তাঁদের সঙ্গীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং আত্মরক্ষার্থেও যুদ্ধ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই কারণেই তিনি আকাবার দ্বিতীয় বায়াত বা শপথের সময় তাঁর কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণকারী মুসলিমদের মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, "আমাদের এমনটি করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।"

মদীনায় হিজরতের পর, নবী (ﷺ)-কে কেবল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এই পর্যায়টি চলাকালীনই বদর, উহুদ, আল-আহযাব (খন্দক)-এর যুদ্ধ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অভিযান ও সামরিক কার্যক্রমসমূহ সংঘটিত হয়েছিল। মদীনা থেকে আহযাব (মিত্রবাহিনী)-এর পিছু হটার সাথে সাথে **জিহাদ** সংক্রান্ত বিধানাবলীর চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয়। খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরে নবী (ﷺ) বলেছিলেন, "এখন আমাদের জন্য তাদের ওপর আক্রমণ করার সময় এসেছে, তারা আর আমাদের ওপর আক্রমণ করবে না। এখন থেকে আমরাই তাদের দিকে অগ্রসর হব।"

কেয়ামত পর্যন্ত **জিহাদের** সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানসমূহ স্পষ্ট করার জন্য সূরা তাওবাহ অবতীর্ণ হয়েছিল। এতে আল্লাহর নির্দেশ ছিল যে, সমস্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। ফলে, আল্লাহর দ্বীন প্রচার করা এবং তাঁর বাণী ও আইনকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জিহাদ একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্যে (ফরজ) পরিণত হয়। নবী (ﷺ) বলেছেন, "আমি কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে তলোয়ারসহ প্রেরিত হয়েছি, যতক্ষণ না অংশীদারহীনভাবে কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। আমার জীবিকা রাখা হয়েছে আমার বল্লমের ছায়াতলে, আর লাঞ্ছনা ও অপমান রাখা হয়েছে তাদের জন্য যারা আমার আদেশের বিরোধিতা করে।"

এক হাতে কুরআন এবং অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন জাতি, রাজ্য, সাম্রাজ্য এবং গোত্রসমূহকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করার জন্য যাত্রা শুরু করে। যে কেউ বিশ্বাস স্থাপন করত তাকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় স্বাগত জানানো হতো, কিন্তু যে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করত তাকে "বিনীত ও নতজানু হয়ে স্বেচ্ছায় জিযয়া (কর) প্রদান করতে হতো", অথবা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে তলোয়ারের মাধ্যমে যুদ্ধ মোকাবেলা করতে হতো।

এই লক্ষ্য কখনো পরিবর্তিত হয়নি। নবী (ﷺ)-এর **দাওয়াহ** আন্দোলন ও **জিহাদ**, সেইসাথে তাঁর সাহাবীগণ এবং তাঁর পরবর্তীকালে যারা এসেছিলেন তাঁদের সবার কার্যক্রম একটি মাত্র লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল, যা রাবঈ বিন আমের এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, **"সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মানুষকে স্রষ্টার ইবাদতের দিকে নিয়ে আসতে"**, এবং যেমনটি আমাদের নবী (ﷺ) বলেছিলেন, **"যতক্ষণ না অংশীদারহীনভাবে কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়।"** কুরআন একে সবচেয়ে চমৎকার ও পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ করেছে:

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফেতনা (নিপীড়ন/শিরক) দূরীভূত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়।" [সূরা আল-আনফাল (৮), আয়াত: ৩৯]

আমাদের নবী (ﷺ)-এর বাণী ছিল অন্তরের প্রতি একটি আহ্বান—**শিরকের** চাদর ছুড়ে ফেলে দিতে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যেকোনো উপাস্যের ইবাদতকে বর্জন করতে। বিজয় দিবসে (মক্কা বিজয়) মক্কার মূর্তিসমূহ ধ্বংস করা ছিল আল্লাহ ছাড়া অন্য সমস্ত উপাস্যের অস্তিত্ব বিলীন করার একটি প্রতীকী ও প্রত্যক্ষ বহিঃপ্রকাশ। কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মুসলিম বাহিনীকে প্রেরণ করা ছিল মূলত **তাওহীদের** প্রতি একটি আহ্বান এবং **শিরকের** অবশিষ্টাংশ মুছে ফেলার একটি উপায়। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধ করা ছিল তাওহীদেরই একটি আহ্বান, যেমনটি নবী (ﷺ) বলেছেন, "আমাকে [আল্লাহর পক্ষ থেকে] মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।"

যুদ্ধ করা ছিল **তাওহীদের** প্রতি এক প্রকার **দাওয়াহ**, কারণ তৎকালীন সাম্রাজ্য ও রাজ্যসমূহের শাসকরা তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব খাটিয়ে ইসলাম এবং ইসলামের দিকে আহ্বানকারীদের আল্লাহর জমিনে ও তাঁর সৃষ্টির কাছে পৌঁছাতে বাধা দিত; তারা দাবি

করত যে এটি তাদের ভূমি এবং এই মানুষগুলো তাদের প্রজা। তাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

এই সমাজগুলোর অত্যাচারী শাসকদের অপসারণের মাধ্যমে **শিরক** গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্যও যুদ্ধ করা প্রয়োজনীয় ছিল, যেখানে তারা মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করত এবং প্রলোভন ও জোরজবরদস্তির মাধ্যমে তাদের মধ্যকার বিবাদসমূহের মীমাংসার জন্য মানবরচিত আইনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য করত।

আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের উপাসনা করা হতো এবং যারা ইসলামের আহ্বানের বিরোধিতা করত, তেমন প্রত্যেক শাসককে অপসারণ করার জন্যও যুদ্ধ করা আবশ্যক ছিল। যে সমস্ত শাসক অহংকারবশত ইসলামে প্রবেশ করতে বা **জিযয়া** প্রদান করতে অস্বীকার করত এবং জমিনে নিজেদের বড়ত্ব প্রকাশ ও ফাসাদ সৃষ্টিতে লিপ্ত থাকত, তাদের প্রতিহত করা প্রয়োজন ছিল।

ফেতনা (নিপীড়ন ও **শিরক**) চিরতরে মুছে ফেলার এবং সব কিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহর আইনকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করা আবশ্যক ছিল:

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়।" [সূরা আল-আনফাল (৮), আয়াত: ৩৯]

আল্লাহ (SWT) ছাড়া অন্য কেউ নিজে কোনো কিছু সৃষ্টি করেছে বলে দাবি করে না। অতএব, আল্লাহর পাশাপাশি বা আল্লাহর পরিবর্তে আইন প্রণয়ন করার অধিকার কারো নেই। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, **"আল্লাহর আইন এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর আইন ছাড়া আল্লাহর কোনো সৃষ্টির মধ্যে ফয়সালা করার অধিকার কারো নেই; এমনকি মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যকার ফয়সালার ক্ষেত্রেও নয়।"**

মুসলিম হিসেবে আমাদের আল্লাহর জমিনে এবং তাঁর সৃষ্টির ওপর আল্লাহর আইনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনো কিছুর দ্বারা মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করার অনুমতি কাউকে না দেওয়ার নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়েছে। যারা এটি অস্বীকার করবে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

কিছু মানুষ হয়তো বলবে যে, আমরা মানবজাতির ওপর আমাদের অভিভাবকত্ব চাপিয়ে দিচ্ছি। আমাদের উত্তর হলো—এটি মূলত আল্লাহর জমিনে এবং তাঁর সৃষ্টির ওপর আল্লাহর আইন ও দ্বীনের অভিভাবকত্ব। আমরা কেবল মানুষের সাধারণ কল্যাণের স্বার্থে এটি বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর নির্দেশ পালন করছি, কারণ আমরা হলাম

"মানবজাতির কল্যাণের জন্য উত্থিত শ্রেষ্ঠ উম্মাহ।" [সূরা আল-ইমরান (৩), আয়াত: ১১০]

প্রকৃতপক্ষে, মানুষ কখনো আল্লাহর আইনের চেয়ে অধিক ন্যায়সংগত বা উত্তম কোনো আইন খুঁজে পাবে না। যে ব্যক্তি ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করতে চায়, সে নিশ্চিতভাবেই ইহকাল ও পরকালে মুক্তি পাবে; কিন্তু যে ব্যক্তি কাফের হিসেবেই থেকে যাওয়া বেছে নেয়, সে তা করার জন্য স্বাধীন—যতক্ষণ না সে **জিযয়া** প্রদান করে এবং ইসলামের আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

অজ্ঞ ও **জাহেলী** ভাবধারার লোকেরা প্রশ্ন করবে, "কিন্তু মানবজাতিকে শাসন ও নেতৃত্ব দেওয়ার এই অধিকার আপনাকে এবং ইসলামকে কে দিয়েছে?" আমাদের উত্তর হলো এই, "আল্লাহ—যিনি মানবজাতির রব, মানবজাতির মালিক এবং মানবজাতির ইলাহ—তিনিই আমাদের এই অধিকার দিয়েছেন।" এরপর আমরা জিজ্ঞাসা করি তাদেরকে, "আর আপনাদের মনে যা চায় সেই অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করার এবং শাসন করার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে?"

আল্লাহর পথে **জিহাদ** সম্পর্কে এটিই আমাদের অনুধাবন। যারা এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন, তাদের বিষয়টি নিয়ে পুনরায় ভাবা উচিত এবং নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের বোঝাপড়া সংশোধন করা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম কেবল অন্তরে ধারণকৃত কিছু বিশ্বাসের সমষ্টি নয়, যার জন্য আমাদের মুখে তা স্বীকার করা এবং কলম ও যুক্তির মাধ্যমে তার পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে এই আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়াই (যার অর্থ) যথেষ্ট হবে:

"বলুন: সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে; অতএব যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা সে কুফরী করুক।" [সূরা আল-কাহাফ (১৮), আয়াত: ৩০]

এটি মূলত এই আয়াতের একটি বিকৃত ও খণ্ডিত ব্যাখ্যা। কারণ ইসলাম হলো একটি জীবনব্যবস্থা; এটি মানুষের জীবনকে পরিচালিত করার জন্য অবতীর্ণ আল্লাহর আইন। এই কারণেই কেবল এমন কোনো বক্তৃতা বা খুতবা দেওয়া যথেষ্ট নয় যেখানে আমরা শুধু আমাদের **আক্বীদা**র কথা উল্লেখ করব এবং তা রক্ষা করব। বরং, আমরা যা কিছু করি তার সব কিছুতেই আমাদের এই বিশ্বাসকে ধারণ করতে হবে: মুখ ও নম্র আচরণের মাধ্যমে **দাওয়াহ;** বাগ্মিতার সাথে প্রমাণ উপস্থাপন; এবং তলোয়ারের মাধ্যমে **জিহাদ**। মুখ, নম্রতা এবং বাগ্মিতা হলো অন্তর ও মনের জন্য; যাতে মানুষ হয় বিশ্বাস স্থাপন করে মানসিক শান্তি লাভ করবে, অথবা ইসলামের আইনকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে

বিনীতভাবে **জিযয়া** প্রদান করবে। কিন্তু যদি তারা অহংকার ও জেদের বশে তা করতে অস্বীকার করে, তবে এই সমস্ত মিথ্যা উপাস্যদের অপসারিত না করা পর্যন্ত আমাদের তলোয়ার ধারণ করতে হবে; এবং কেবল তখনই আমরা এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পারি (যার অর্থ):

"বলুন: সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে; অতএব যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা সে কুফরী করুক।"

ইসলামে যুদ্ধ করার পিছনের কারণ এটিই, যেমনটি আল্লাহ (SWT) বলেন (যার অর্থ),

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফেতনা দূpiiভূত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়।"

এবং ইসলাম এই ধরনের পর্যায়গুলোর মধ্য দিয়েই অতিক্রম করেছে। এটি যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং যার বিধানসমূহ কেয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, তা নিম্নলিখিত আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে (যার অর্থ):

"আর তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করো, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করে থাকে।" [সূরা আত-তাওবাহ (৯), আয়াত: ৩৬]

"অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো (ইসলামী বর্ষপঞ্জির ১ম, ৭ম, ১১তম এবং ১২তম মাস) অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদের যেখানেই পাবে হত্যা করো, তাদের বন্দী করো, তাদের অবরুদ্ধ করো এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওত পেতে থাকো।" [সূরা আত-তাওবাহ (৯), আয়াত: ৫]

"তোমরা যুদ্ধ করো আহলে কিতাবদের (ইহুদি ও খ্রিস্টান) সেইসব লোকের বিরুদ্ধে যারা (১) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, (২) পরকালের প্রতিও নয়, (৩) এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না, (৪) এবং সত্য দ্বীন (অর্থাৎ ইসলাম) স্বীকার করে না; যতক্ষণ না তারা বিনীতভাবে ও নতজানু হয়ে জিযয়া প্রদান করে।" [সূরা আত-তাওবাহ (৯), আয়াত: ২৯]

ইসলামে **জিহাদ** পরিচালনা করার কারণসমূহ এগুলোই।

যদিও ইসলামের জন্য **জিহাদ**-এর বাধ্যবাধকতার যৌক্তিকতা প্রমাণের কোনো প্রয়োজন নেই, তবুও যারা এটি নিয়ে কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন—যেন এটি আমাদের ধর্মের মুখে একটি কলঙ্ক—তাদের বিষয়টি মনে করিয়ে দেওয়াতে কোনো ক্ষতি নেই; বিশেষ করে যারা জাহিলিয়াত ও এর অনুসারীদের সন্তুষ্ট করতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে, যারা তাদের **জাহেলী** মতবাদ ও আইনের জন্য লড়াই করতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করে না।

এখানে "Screenshot 2026-06-15 at 2.11.35 AM.jpg" ফাইলটিতে থাকা লেখার একটি মার্জিত ও পেশাদার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো:

আজ বহু মুসলিম **জিহাদ** থেকে দূরে থাকে এবং এটি নিয়ে কথা বলা এড়িয়ে চলে। এমনটা করার পেছনে তারা বিভিন্ন অজুহাত খোঁজে, যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তাদের 'প্রভুদের' সন্তুষ্ট করা যায় এবং তাদের ক্ষোভ বা কোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়!

আজ এমন কিছু মুসলিমও রয়েছে যারা প্রশ্ন তোলে, "জিহাদ বলতে আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন? আল্লাহ তো আমাদের কেবল **দাওয়াহ** বা দ্বীনের প্রচারের কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ তিনি বলেন (যার অর্থ):

"তুমি তোমার রবের পথের দিকে আহ্বান করো হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে তর্ক করো এমন পদ্ধতিতে যা সর্বোত্তম।" [সূরা আন-নাহল (১৬), আয়াত: ১২৫]

এই লোকেরা ভুলবশত বিশ্বাস করে যে, **জিহাদ** মানুষের মাঝে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার আল্লাহর নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক। অথচ তারা এই সত্যটি উপেক্ষা করে, বা উপেক্ষা করার ভান করে যে, এই আয়াতটি **দাওয়াহ**-এর শরয়ী জ্ঞান ও এর পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত। আর **জিহাদ**-এর নিজস্ব বিজ্ঞান (শাস্ত্র) এবং এর নিজস্ব আয়াতসমূহ রয়েছে, যা এর বিধান ও শরয়ী জ্ঞানের রূপরেখা প্রদানের পাশাপাশি একে আদেশ ও অপরিহার্য করে তোলে:

"হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল হলো জাহান্নাম, আর সেই গন্তব্যস্থল কতই না নিকৃষ্ট।" [সূরা আত-তাওবাহ (৯), আয়াত: ৭৩]

আবার কিছু মুসলিম এমনও রয়েছে যারা বলে, "ইসলামে **জিহাদ** কেবলই আত্মরক্ষার জন্য! সুতরাং **জাহিলিয়াত** তার নিজের ভূমিকায় আশ্বস্ত থাকুক; কারণ এটি আমাদের ভূমিতে আমাদের ওপর আক্রমণ না করা পর্যন্ত আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করব না, এবং আসুন আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করি!" যারা এই ধরনের মূর্খতাপূর্ণ মতামত পোষণ করে, সেই অজ্ঞরা তাদের নির্বুদ্ধিতায় ইসলামকে **জাহিলিয়াত**-এর সমকক্ষ করার চেষ্টা করে; যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর সৃষ্টির একটি অংশের ওপর জাহিলিয়াতকে নিজস্ব আইনকানুন ও বৈধতা চর্চা করার এবং আল্লাহর জমিনের একটি নির্দিষ্ট অংশে আধিপত্য বিস্তার করার অধিকার দিয়ে দেয়!

এছাড়াও এমন কিছু লোক আছে যারা বলে যে, **জিহাদ** অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা উচিত। তারা তাদের এই ভিত্তিহীন দাবির পক্ষে এই যুক্তি দেখায় যে, নবী (ﷺ) প্রথমে গোপনে তাঁর **দাওয়াহ** শুরু করেছিলেন, তারপর সমস্ত ক্ষতি ও কষ্ট সহ্য করেও তা প্রকাশ্যে চালিয়ে যান, এরপর যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং সবশেষে কোনো উসকানির অপেক্ষা না করেই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন। তাহলে আমরা কেন আমাদের নবী (ﷺ)-এর মতো একই পর্যায়গুলোর মধ্য দিয়ে যাব না? বিষয়গুলো নিয়ে তাড়াহুড়ো করার কী দরকার?

এই ধরনের অজ্ঞরা স্রেফ ভুলে যায়, বা ভুলে যাওয়ার ভান করে যে, নবী (ﷺ) এই সবকিছুই করেছিলেন আল্লাহর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে; এবং তিনি যদি এই আদেশগুলো অমান্য করতেন বা লঙ্ঘন করতেন তবে তিনি গুনাহগার হতেন (তিনি এমন করা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন)। তারা ভুলে যায়, বা ভুলে যাওয়ার ভান করে যে, **জিহাদ**-এর বিধানসমূহ এর চূড়ান্ত পর্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এবং আমরা যদি এই বিধানগুলোকে অবহেলা করি বা বর্জন করি, তবে আমরা নিশ্চিতভাবেই পাপ বা গুনাহের কাজ করব।

কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা বিশ্বাস করে যে **জিহাদ** একটি অনস্বীকার্য বাধ্যবাধকতা (ফরজ), তবে তারা এটি মেনে নেয় যে একজন শক্তিশালী মুসলিম খলীফার নেতৃত্ব ছাড়া আমাদের এটি শুরু করা উচিত নয়; আর যেহেতু বর্তমান সময়ে আমাদের এমন কোনো নেতা নেই, তাই আমাদের মোটেও **জিহাদ**-এর চেষ্টা করা উচিত নয়!

পুনরায়, অজ্ঞতা বা বিদ্বেষবশত তারা ওলামায়ে কেরামের সেই উক্তিটিকে গুলিয়ে ফেলে—যেখানে বলা হয়েছে যে মুসলিম শাসকের অনুমতি ছাড়া **জিহাদ** পরিচালনা করা উচিত নয়—এবং সেই বিদ্যমান পরিস্থিতির সাথে গুলিয়ে ফেলে যেখানে কোনো মুসলিম শাসক ক্ষমতায় নেই। আমরা যেখানে আমাদের ওপর শাসন পরিচালনার জন্য **জিহাদ**-এর মাধ্যমে একজন মুসলিম শাসক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছি, সেখানে কিছু লোক কীভাবে আমাদের কাছে এসে বলতে পারে যে একজন মুসলিম শাসক ছাড়া **জিহাদ** অনুমোদিত নয়?

ইবন কুদামাহ বলেন, **"মুসলিম শাসকের অনুপস্থিতিকে জিহাদ স্থগিত রাখার অজুহাত হিসেবে [ব্যবহার করা] উচিত নয়, অন্যথায় এর প্রয়োজনীয়তা এবং সুফলসমূহ এমনটা করার কারণে নষ্ট হয়ে যাবে; এবং যদি মুসলিমরা [যুদ্ধ থেকে] কোনো গণিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করে, তবে তা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বণ্টন করা উচিত।"**

ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, **"যে ব্যক্তি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা এবং পাপাচারীদের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব নিজের ওপর তুলে নেয়, সেই সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহর আনুগত্যমূলক যত কাজের আদেশ সে দেয়, তার সব কিছুতেই তাকে মেনে চলতে হবে।"**

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, [জিহাদ না করার] নানা মত ও অজুহাতের এতো প্রাচুর্য কেন। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর; এই দায়িত্বটি অত্যন্ত কঠিন এবং এর জন্য মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হয় এবং নিজের স্ত্রী-সন্তানদের ছেড়ে যেতে হয়। যেখানে মানুষের অন্তর এই পার্থিব জীবনের প্রতি ভালোবাসায় এবং মৃত্যুর প্রতি তীব্র ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, সেখানে তারা কাপুরুষতা দেখাবে না কেন? নবী (ﷺ)-এর সময়েও এই ধরনের অজুহাত প্রচলিত ছিল। কেউ কেউ বলেছিল (যার অর্থ),

"আমাকে অনুমতি দিন (জিহাদ থেকে অব্যাহতি দিন) এবং আমাকে ফেতনায় বা পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন না।" [সূরা আত-তাওবাহ (৯), আয়াত: ৪৯]

অন্যরা বলেছিল (যার অর্থ):

"এই তীব্র গরমের মধ্যে যুদ্ধে বের হয়ো না।" [সূরা আত-তাওবাহ (৯), আয়াত: ৮১]

"যদি আমরা জানতাম যে যুদ্ধ হবেই, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম।" [সূরা আল-ইমরান (৩), আয়াত: ১৬৭]

"হে আমাদের রব! আপনি কেন আমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করলেন? আপনি যদি আমাদের আর কিছুকালের জন্য অবকাশ দিতেন!" [সূরা আন-নিসা (৪), আয়াত: ৭৭]

"এই লোকদের (মুসলিমদের) তাদের দ্বীন বা ধর্ম বিভ্রান্তিতে ফেলেছে।" [সূরা আল-আনফাল (৮), আয়াত: ৪৯]

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের কেবল প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন!" [সূরা আল-আহযাব (৩৩), আয়াত: ১২]

"তোমাদের দাঁড়ানোর মতো কোনো জায়গা [শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে] নেই, অতএব তোমরা ফিরে যাও!" [সূরা আল-আহযাব (৩৩), আয়াত: ১৩]*

"আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদের ব্যস্ত রেখেছিল, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" [সূরা আল-ফাতহ (৪৮), আয়াত: ১১]

"প্রকৃতপক্ষে, আমাদের ঘরবাড়ি অরক্ষিত [শত্রুর সামনে খোলা] অবস্থায় রয়েছে।" [সূরা আল-আহযাব (৩৩), আয়াত: ১৩]

কিন্তু আল্লাহর বাণী এই সমস্ত মানুষকে কাপুরুষ ও মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে অবতীর্ণ হয়েছে:

"আর যদি তারা যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে অবশ্যই তার জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত; কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রা পছন্দ করেননি, তাই তিনি তাদের পিছিয়ে রাখলেন এবং [তাদের] বলা হলো: 'তোমরা ঘরে বসে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাকো'।" [সূরা আত-তাওবাহ (৯), আয়াত: ৪৬]

মুনাফিক এবং যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদের আরোহণের জন্য **জিহাদ** এক অতি উচ্চ চূড়া হিসেবেই রয়ে গেছে। যারা একে ঘৃণা করেছে, আল্লাহর পথে **জিহাদ** তাদের জন্য একটি অপ্রিয় বিষয় হিসেবেই রয়ে গেছে; এটি তাদের অবজ্ঞা করে, যেমনটি তারা একে অবজ্ঞা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল তার নিজস্ব একদল মানুষের জন্যই সংরক্ষিত, যারা পরম দয়াময় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার আকুল আগ্রহে এবং তাঁর জান্নাতে বসবাসের আশায় এই পৃথিবীর জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। **জিহাদ** কেবল তার নিজস্ব একদল মানুষেরই একান্ত মস্তিস্কপ্রসূত বিষয়, যারা জানে যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর আরোপিত একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য (ফরজ)। এটি ইসলামের প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত একটি অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা, যা **জাহিলিয়াত** দ্বারা উসকে দেওয়া হয়েছে এবং ইতিহাস দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

জিহাদ হলো **শরীয়ত** নির্ধারিত এমন একটি অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা, যা বেশ কিছু বাধ্যতামূলক কাজের (ফরজ) সাথে জড়িত, যেগুলো আজ **জিহাদ** পরিচালনা করা ছাড়া পূর্ণ করা সম্ভব নয়। এটি আমাদের ওপর আবশ্যক করা হয়েছে নিচের বিষয়গুলোর মাধ্যমে:

১. কাফের শাসককে অপসারণ করার বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (ইজমা)। আমাদের শাসকরা কি **শরীয়ত**-কে মানবরচিত আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করে এবং জনগণকে **জাহেলী** আইন দ্বারা শাসন করার কারণে কাফের হিসেবে গণ্য হন না? এই ধরনের শাসকদের অপসারণ করার জন্য আমাদের ওপর কি আজ **জিহাদ** বাধ্যতামূলক নয়?

২. এক বা একাধিক ইসলামী আইন দ্বারা শাসন পরিচালনা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী যেকোনো শক্তিশালী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তারা তা মেনে না নেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করার বিষয়ে **ওলামা**দের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আমাদের দেশগুলোতে আজ আধিপত্য বিস্তারকারী গোষ্ঠীগুলো কি অধিকাংশ ইসলামী আইনের প্রতি দায়বদ্ধতাহীন নয়? তারা

আল্লাহর যে আইনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তা মেনে চলতে তাদের বাধ্য করার জন্য আমাদের ওপর কি **জিহাদ** বাধ্যতামূলক নয়?

৩. একজন খলীফা নিযুক্ত করার বিষয়ে **ওলামা**দের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আজ কি খিলাফত অনুপস্থিত নয়? আমাদের শত্রুরা কি শক্তি প্রয়োগ ও তলোয়ারের মাধ্যমে এটি বিলুপ্ত করেনি? তাহলে এটি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র উপায় কি **জিহাদ** নয়?

৪. মুসলিম ভূখণ্ড রক্ষা করা এবং কাফেরদের দ্বারা দখলকৃত তার সমস্ত অংশ পুনরুদ্ধার করার বিষয়ে **ওলামা**দের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। অতএব, ফিলিস্তিন, আন্দালুসিয়া (স্পেন), বলকান অঞ্চল, মধ্য এশিয়ার মুসলিম প্রজাতন্ত্রসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশ যা একসময় মুসলিমদের ছিল, তা পুনরুদ্ধার করার জন্য কি **জিহাদ** বাধ্যতামূলক নয়?

৫. সমস্ত বন্দী মুসলিমদের মুক্ত করতে সাহায্য করার বিষয়ে **ওলামা**দের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। বিশ্বজুড়ে জেলখানা ও আটক কেন্দ্রগুলো কি হাজার হাজার মুসলিম স্কলারে (আলেম) পরিপূর্ণ নয়? তাদের উদ্ধার করার জন্য কি **জিহাদ** বাধ্যতামূলক নয়?

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের দেশগুলোতে আধিপত্য বিস্তারকারী কাফের শাসকদের অপসারণ করা, এই শাসকদের ঘিরে থাকা, তাদের সমর্থনকারী এবং তাদের মানবরচিত আইন রক্ষাকারী গোষ্ঠীগুলোকে প্রতিহত করা, সমস্ত মুসলিমের জন্য একজন খলীফা নিযুক্ত করা, আমাদের হারানো ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করা এবং বন্দী মুসলিমদের মুক্ত করতে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধ করা আমাদের ওপর অবধারিত।

অতঃপর আমাদের বাহিনী বিশ্বে পরিভ্রমণ করবে, কুরআন এবং তলোয়ারের মাধ্যমে সাম্রাজ্য ও রাজ্যসমূহকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানাবে; ঠিক যেভাবে আমাদের **উম্মাহর** প্রথম প্রজন্ম পারস্য, রোম এবং অন্যান্য ভূখণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় করেছিল।

তাহলে, এই সমস্ত শরয়ী বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নের মাধ্যম কি **জিহাদ** নয়? নাকি আমরা এগুলোকে অবহেলা করব এবং এর ফলে পাপী হব ও আমাদের ঈমান হারাব?

নাকি আমরা পরকালের পরিবর্তে এই পার্থিব জীবনকে উপভোগ করে "মাটির প্রতি গভীরভাবে ঝুঁকে থাকব,"[93] নাকি আমরা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব?

"আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও [ইসলাম এবং আল্লাহর আনুগত্য থেকে], তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তারা তোমাদের মতো হবে না।" [সূরা মুহাম্মদ (৪৭), আয়াত: ৩৮]

আমরা এই সত্যটি সম্পর্কে অবগত যে, এমন অনেক সৎ ও আন্তরিক মুসলিম রয়েছেন যারা আমাদের সাথে একমত যে আল্লাহর পথে **জিহাদ** একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তারা একে অবহেলা করার ভয়াবহতাকেও ভয় পান, পাছে তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান যাদের সম্পর্কে নবী (ﷺ) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি যুদ্ধ না করে অথবা যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা না রেখে মৃত্যুবরণ করল আল্লাহর পথে, সে মুনাফিকীর একটি শাখার ওপর মৃত্যুবরণ করল।**" কিন্তু যখন তারা মুসলিমদের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকায়, তখন তারা দেখতে পায় যে তারা নির্যাতিত এবং এক দুর্বল অবস্থায় রয়েছে, যাদের কোনো শক্তি, রাষ্ট্র কিংবা **ইমাম** নেই। পরিস্থিতির এই রূপ তাদেরকে এতটাই হতাশ করে যে তারা বর্তমান নিপীড়নের সাথে আপস করে **জিহাদ**-কে বিলম্বিত করতে চায়, এবং নবী (ﷺ) যেসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, অবিকল সেই একই পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাওয়াতেই নিজেদের সন্তুষ্ট রাখে।

এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এই লোকেরা একটি মারাত্মক ভুল করছে। কারণ নবী (ﷺ) এবং তাঁর অনুসারীগণ যখন নিজেদের যুদ্ধ করা থেকে বিরত রেখেছিলেন, তখন তা করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। পক্ষান্তরে আজ আমাদের ক্ষেত্রে, কুরআনে বর্ণিত **জিহাদ** সংক্রান্ত চূড়ান্ত বিধান অনুযায়ী আমাদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি এই বাধ্যবাধকতাকে অবহেলা করি, তবে আমরা নিশ্চিতভাবেই পাপ বা গুনাহের কাজ করব।

কিছু লোক হয়তো বলবে, "কিন্তু আমরা তো তা করতে পারি না, কারণ আমরা একটি দুর্বল অবস্থানে রয়েছি; আমরা এটি পছন্দ করি আর না করি, আমাদের ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে হবে।"

আমাদের উত্তর হলো—না, এর বিপরীতে, আমাদের অবশ্যই এমন একটি দিন না আসা পর্যন্ত **জিহাদের** জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে যেদিন আমরা তা পরিচালনা করতে সক্ষম হব, এবং তখন আমরা যুদ্ধ করব। আমাদের পূর্ববর্তী বহু প্রজন্মের দুর্বলতার ফলে আমরা নিজেদের যে ভয়ানক অচলাবস্থার মধ্যে আবিষ্কার করেছি, তা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় এটিই। আমাদের নিজেদের চারপাশে আমরা যে দেয়াল তুলেছি, তা আমাদের ভেঙে ফেলতে হবে। নিম্নলিখিত আয়াতে আল্লাহ কি আমাদের উদ্দেশ্য করেই বলেননি (যার অর্থ):

"আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি ও যুদ্ধের ঘোড়া (ট্যাংক, বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, কামান ইত্যাদি) প্রস্তুত রাখো, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের আতঙ্কিত করবে," [সূরা আল-আনফাল (৮), আয়াত: ৬০]

মক্কার প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের সাথে আমাদের প্রধান পার্থক্যগুলোর মধ্যে এটি একটি। তাঁরা যুদ্ধ করেননি কিংবা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেননি কারণ তাঁদের তেমন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আজ আমরা নিশ্চিতভাবেই যুদ্ধ করতে বাধ্য। তবে যদি আমরা তা করতে অসমর্থ হই, তবে আমাদের যুদ্ধ করার সক্ষমতা অর্জন না করা পর্যন্ত **জিহাদ**-এর প্রস্তুতি নিতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের প্রস্তুতিকালীন সময়ে নিজেদের এমন কোনো দুর্বলতার পর্যায়ের মধ্যে বসবাসকারী ভাবা উচিত নয়, যেমনটি প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা মক্কায় বাস করেছিলেন। কারণ সেই পর্যায়টি তার সমস্ত বিধানসহ রহিত হয়ে গেছে। বরং আমরা এক প্রকার 'প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ের' মধ্যে রয়েছি। আজ আমরা যে পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এবং মক্কার সেই দুর্বলতার পর্যায়—যেখানে মুসলিমদের কাফেরদের থেকে হাত গুটিয়ে রাখার এবং তাদের প্রতি ধৈর্য ও ক্ষমা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, সেই সময়ে মুমিনদের ওপর কোনো যুদ্ধ বা এর প্রস্তুতি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা চাপানো হয়নি। ফলশ্রুতিতে, **সাহাবীগণ** সেই পর্যায়ে কোনো ধরনের যুদ্ধে জড়ানো এড়িয়ে চলেছিলেন।

তবে আজ, বহু মুসলিমের দ্বারা অবহেলিত এই ধর্মীয় দায়িত্বটি পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আমাদের এর জন্য প্রস্তুতি নিতে আমরা বাধ্য। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, **"দুর্বলতার কারণে যখন জিহাদ পরিচালনা করা সম্ভব হয় না, তখন সেই সময়ে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য (ফরজ)। কারণ এমন যেকোনো বিষয়, যা ছাড়া কোনো একটি ফরজ দায়িত্ব পূর্ণ করা যায় না, সেটি নিজেও একটি ফরজ।"**

জিহাদ হলো এমন একটি বাধ্যবাধকতা যা আমাদের ওপর এই ঈমানের প্রকৃতি এবং আমাদের চারপাশের **জাহিলিয়াত**-এর প্রকৃতি দ্বারা আরোপিত হয়েছে। এই পৃথিবীতে ইসলাম এবং কুফর শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারে না। তাদের নিজস্ব প্রকৃতির কারণেই, এক পক্ষ অন্য পক্ষকে এই পৃথিবীর কোনো অংশে আধিপত্য বিস্তার করতে দেখতে পছন্দ করে না, তারা একে অপরের থেকে যত দূরে বা বিচ্ছিন্নই থাকুক না কেন। তারা কোনোভাবেই এক নয়, কারণ তারা উভয়ই একে অপরকে উপড়ে ফেলতে এবং নিশ্চিহ্ন করতে প্রবৃত্ত হয়। আল্লাহ যতদিন না এই পৃথিবী এবং এর মধ্যকার সব

কিছুর মালিকানা গ্রহণ করছেন (কিয়ামত), ততদিন এই দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের এই চক্র চলতেই থাকবে। নবী (ﷺ) বলেছেন, **"আমার উম্মতের একটি দল উম্মাহ সত্যকে সমুন্নত রাখা বজায় রাখবে, যতক্ষণ না তাদের সর্বশেষ দলটি আদ-দাজ্জাল (অ্যান্টি-ক্রাইস্ট)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করবে।"**

এটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানগুলোর মধ্যে একটি, যা আমাদের উপেক্ষা বা অবহেলা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। আমরা যদি এটি উপেক্ষা করার চেষ্টা করি, তবে আমাদের শত্রুরা ক্ষান্ত হবে না যতক্ষণ না—আল্লাহ না করুন—তারা আমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে, যদি তারা তা করতে সক্ষম হয়। এই লড়াইয়ে উভয় শিবিরেরই স্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে; যদিও কুফর বা কাফের শিবির সর্বদা তাদের আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখার, আমাদের সারিতে অনুপ্রবেশ করার এবং আমাদের অতর্কিতভাবে আঘাত করার চেষ্টা করে, যখন আমরা তাদের চাতুরী ও মন্দ পরিকল্পনা সম্পর্কে অসচেতন থাকি।

ইসলামের লক্ষ্য হলো কুফরকে ধ্বংস করা, একে সমূলে উপড়ে ফেলা, মানবজাতির ওপর এর আইনকানুন ও রীতিনীতির আধিপত্য বিস্তার রোধ করা এবং একে আহলে কিতাবদের অন্তরে থাকা কিছু মৃত বা অচল বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া; যার ফলে তারা সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে অক্ষম হবে, কারণ ইসলামী আইন তাদের বিনীতভাবে ও নতজানু হয়ে **জিযয়া** প্রদান করতে বাধ্য করে। ইসলামের লক্ষ্য হলো কুফরের শিকড় নির্মূল করে সেই স্থানে ঈমান বা বিশ্বাস রোপণ করা এবং আল্লাহর আইনকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য **জাহিলিয়াত**-এর বিশ্বাস ও আইনকানুনকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা। এটিই ইসলামের লক্ষ্য এবং মুসলিমদের অবশ্যই এটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। অন্যদিকে, **শিরক** চায় ইসলামকে ধ্বংস করতে, এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বিলীন করতে এবং এর আইনকানুনকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে। এটি অর্জনের জন্য তারা তাদের হাতে থাকা সমস্ত উপায় ব্যবহার করে, কোনো প্রচেষ্টা বাকি রাখে না এবং কোনো ষড়যন্ত্র অপূর্ণ রাখে না। নিম্নলিখিত আয়াতসমূহে কুরআন আমাদের এই বিষয়েই অবহিত করে (যার অর্থ):

"আহলে কিতাবদের (ইহুদি ও খ্রিস্টান) অনেকেই তাদের কাছে সত্য [যে মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল] প্রকাশিত হওয়ার পরও, নিজেদের অন্তরের হিংসার বশে চায় যে, তোমরা ঈমান আনার পর তারা যদি তোমাদের আবার কাফেরে পরিণত করতে পারত!" [সূরা আল-বাকারাহ (২), আয়াত: ১০৯]

"আর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তারা তা করতে সক্ষম হয়।" [সূরা আল-বাকারাহ (২), আয়াত: ২১৭]

"আর ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আপনার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাত বা আদর্শের অনুসরণ করেন।" [সূরা আল-বাকারাহ (২), আয়াত: ১২০]

"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়।" [সূরা আত-তাওবাহ (৯), আয়াত: ৩২]

আমাদের শত্রুদের এই স্পষ্ট শত্রুতার প্রমাণগুলোকে উপেক্ষা করা এবং কুফরকে রক্ষাকারী, এর পতাকা উত্তোলনকারী ও একে বিজয়ীকারী সমস্ত বৈষয়িক শক্তিকে পরাস্ত করার আগে এবং কুফরের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিলীন ও এর সমস্ত শাসনব্যবস্থাকে ধ্বংস করার আগে আমাদের তলোয়ার আবার খাপে পুরে রাখা হবে চরম মূর্খতা। আমরা যদি কুফরের বিরুদ্ধে লড়াই না করি, তবে তারা আমাদের ওপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে—এমনটা ভাবা হবে আমাদের বোকামি। আমরা যদি এমন ভুল করি, তবে আমরা নিঃসন্দেহে দ্বিগুণ ক্ষতির সম্মুখীন হব: একবার এই জীবনে এবং আবারও পরকালে। আমরা আমাদের ঈমান এবং আমাদের জীবন উভয়ই হারাব, কারণ কুফরের দল নিশ্চিতভাবেই আমাদের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ করবে; কারণ আমাদের ক্ষেত্রে তারা কোনো চুক্তি বা সম্মানের পরোয়া করে না। আমরা তাদের সামনে তলোয়ার ধারণ না করলেও তারা আমাদের ওপর গণহত্যা চালাবে। ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্য দেয় এবং আমাদের শিক্ষা দেয় যে **জিহাদ** একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। নবী (ﷺ) হিজরতের আগে কুরাইশদের বিরুদ্ধে কখনো তলোয়ার তোলেননি, কিন্তু এটি তাদের তাঁর ক্ষতি করা এবং তাঁর অনুসারীদের হত্যা করা থেকে বিরত রাখেনি। তারা এটি করেছিল স্রেফ এই কারণে যে, তিনি তাদের এই বলে আহ্বান জানিয়েছিলেন: "আমি এক ভয়াবহ আজাবের পূর্বে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী মাত্র," এবং "বলো: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।"

নবী (ﷺ) মক্কায় থাকা অবস্থায় কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ পাননি। পক্ষান্তরে, তিনি যে কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা ক্ষমা করার ও উপেক্ষা করার নির্দেশ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই **জাহিলিয়াত**-কে মুসলিমদের ওপর নির্যাতন চালানো এবং তাদের হত্যা করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তৎকালীন জাহিলিয়াতের

একমাত্র লক্ষ্যই ছিল মুসলিমদের তাদের ঈমান থেকে জোরপূর্বক বিচ্যুত করা এবং পুনরায় তাদের কুফরীর গণ্ডিতে ফিরিয়ে আনা।

কুরাইশরা যখন মদীনায় হিজরত করার বিষয়ে নবী (ﷺ)-এর অভিপ্রায় বুঝতে পারল, তখন তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য তাদের সমস্ত শক্তি একত্রিত করেছিল; অথচ তিনি তাদের জন্য তাদের ভূখণ্ড, তাদের মানুষ এবং তাদের মিথ্যা উপাস্যদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ (SWT) তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে রক্ষা করেছিলেন, যিনি নিরাপদে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও, কুরাইশরা তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই তাঁকে জীবিত বা মৃত ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর পিছনে লোক পাঠিয়েছিল।

কাফেররা ইসলামকে তার নিজের মতো ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়, যদিও এটি তাদের ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরে অন্য কোনো ভূমিতে নিজের পথ তৈরি করে নেয়। তাদের নিজস্ব স্বভাব বা প্রকৃতির কারণেই তারা যেখানেই হোক না কেন একে ধ্বংস করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই কারণেই তারা বদর, উহুদ এবং আল-আহযাব (খন্দক)-এর যুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের বাহিনী পরিচালনা করেছিল এবং এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা নবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন না করে ফিরে না যাওয়ার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

নতুন রূপ লাভ করা দ্বীনের (ঈমান) প্রয়োজনেই আল্লাহ নবী (ﷺ)-কে কাফেরদের আক্রমণের মুখে ধৈর্য ধারণ করার এবং পাল্টা জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল, এবং আল্লাহ (SWT) তাঁর নবী (ﷺ), তাঁর দ্বীন এবং কাফেরদের মন্দ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তাঁর **দাওয়াহ**-কে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু যখন নবী (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীগণ মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেওয়া হলো। তাঁরা তখন এমনটা বলেননি যে, "আসুন আমরা কাফেরদের ক্ষমা করে দিই এবং মক্কায় যেভাবে ধৈর্য ধরেছিলাম সেভাবেই ধৈর্য ধরি, আর আল্লাহ যেভাবে তখন তাঁর দ্বীন রক্ষা করেছিলেন সেভাবেই রক্ষা করবেন।" তাঁরা যদি এমনটা বলতেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতেন, তবে কুরাইশদের বাহিনী নিশ্চিতভাবেই তাঁদের চিরতরে পরাস্ত করত এবং ইসলাম আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না।

পরবর্তীকালে, যখন সমস্ত **মুশরিকদের** বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলো **"যতক্ষণ না দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়"**, তখন মুসলিমদের

এই কথা বলে মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থান করার অনুমতি দেওয়া হয়নি যে—তাঁরা কেবল নিজেদের আত্মরক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন এবং নিজেরা কোনো যুদ্ধ শুরু করবেন না। তাঁরা যদি এমনটা বলতেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতেন, তবে তাঁদের **দাওয়াহ** মদীনার সীমানা ছাড়িয়ে প্রসারিত হতো না এবং শত্রুভাবাপন্ন আরব গোত্রগুলো তাঁদের ভূখণ্ডে ইসলামের একটি পদক্ষেপও অগ্রসর হওয়া প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধ হতো। তদুপরি, তাঁরা যদি তেমনটা করতেন, তবে তাঁরা পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারতেন না এবং কুফরের বাহিনীসমূহ আদেশ অমান্যকারী এই অল্পসংখ্যক মুমিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। আল্লাহর এই নির্দেশ ছিল **জিহাদ** পরিচালনা করার এবং নতুন এই দ্বীনকে চিরতরে শেষ করে দেওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য।

কিন্তু এগুলোর কোনোটিই ঘটেনি। কারণ আল্লাহ (SWT) তাঁর হিকমত ও ক্ষমতার দ্বারা মুসলিমদের এমন এক প্রজন্ম গড়ে তোলার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যারা বলবে (যার অর্থ), "আমরা শুনলাম এবং আমরা আনুগত্য করলাম," এমন এক প্রজন্ম যারা **জিহাদ** পরিচালনার নির্দেশ পেলে ধৈর্য সহকারে তা পালন করবে। এই প্রজন্মের কাঁধের ওপরই ইসলামের প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল এবং তাঁদের রক্তের মাধ্যমেই এর **দাওয়াহ** ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এর ভূখণ্ড সম্প্রসারিত হয়েছিল।

ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষী যে, যখনই মুসলিমরা দুর্বলতা বা অবহেলার কারণে হাত গুটিয়ে বসে থেকেছে এবং অগ্রসর হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তখনই **জাহিলিয়াত** তার নিজস্ব বাহিনী নিয়ে তাঁদের ওপর চড়াও হয়েছে এবং তাঁদের ভূখণ্ড ও ঘরবাড়িতে আক্রমণ করেছে। আমাদের জন্য এটি একটি বিরাট শিক্ষা যে, আমরা যে বিন্দু থেকে আমাদের অগ্রগতি থামিয়ে দেব, আমাদের শত্রুরা ঠিক সেই বিন্দু থেকেই আমাদের ওপর আক্রমণ করা এবং আমাদের জয় করা শুরু করবে। যখন পূর্বে চীনের প্রাচীরের কাছে এসে মুসলিমদের অগ্রগতি থেমে গিয়েছিল, তখন কিছুকাল পরে ইসলামের ধ্বংসসাধন, মুসলিমদের গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং খিলাফতকে টুকরো টুকরো করার জন্য পিছন থেকে তাতারদের বিশাল বাহিনী ধেয়ে এসেছিল।

একইভাবে, আন্দালুসিয়া (স্পেন) এবং দক্ষিণ ফ্রান্স বিজয়ের পর যখন মুসলিমদের অগ্রগতি থমকে যায়, তখন মুসলিম বাহিনী এক বিধ্বংসী পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে, ক্রুসেডাররা আমাদের স্পেন থেকে বিতাড়িত করার জন্য সেই একই অঞ্চল থেকে ধেয়ে আসে। এরপর তাদের সেনাবাহিনী এবং জাহাজগুলো 'উত্তমাশা অন্তরীপ'

(Cape of Good Hope) প্রদক্ষিণ করে লোহিত সাগরে আধিপত্য বিস্তার করে এবং হিজাজ ভূমিকে হুমকির মুখে ফেলতে এর পূর্ব উপকূলে অবতরণ করে।

অনুরূপভাবে, ভিয়েনার তোরণে এসে যখন অটোমান (উসমানীয়)দের অগ্রগতি থেমে যায়, তখন ইউরোপীয় বাহিনী ইস্তাম্বুলের খিলাফতের পতন ঘটাতে এবং মুসলিম সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে দিতে মহাদেশটির কেন্দ্রস্থল থেকে অগ্রসর হয়।

প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি বিরাট শিক্ষা যা ইতিহাস আমাদের দেয়; যেন এটি আমাদের বলছে, "তোমরা যদি সত্যকে নিয়ে লড়াই না করো, তবে তোমাদের শত্রু বাতিল বা মিথ্যাকে নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তোমরা যদি তাদের আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর না হও, তবে তারা তোমাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে আসবে। তোমরা যদি তরবারির মাধ্যমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে না আসো, তবে তারা তরবারির দ্বারাই তোমাদের আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাবে।"

ইতিহাস আমাদের যে শিক্ষা দেয়, এই দ্বীনের যে প্রকৃতি, শত্রুদের গোপন ও মন্দ ষড়যন্ত্রসমূহ এবং ইসলামের বিধানাবলি—এই সবই আল্লাহর পথে **জিহাদ**-এর প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে।

ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন: **"সমস্ত মুসলিমের মধ্যে এই বিষয়ে সর্বসম্মত ঐক্য রয়েছে যে, যেহেতু নির্ধারিত যুদ্ধের ভিত্তি জিহাদের ওপর নির্ভরশীল—যাতে সমস্ত দ্বীন আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয় এবং তাঁর বাণী সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়—তাই যে কেউ জিহাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, মুসলিমদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করার কথা নয়—যেমন নারী, শিশু, সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ, অন্ধ এবং আহলে কিতাব যারা জিযয়া প্রদান করে—তাদের হত্যা করা যাবে না, যতক্ষণ না তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বা কাজের মাধ্যমে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।"**

এটিই **ওলামা**দের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যকার ঐকমত্য (ইজমা)। যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই মত পোষণ করেন যে, কেবল কুফরের কারণেই এই সমস্ত লোককে হত্যা করতে হবে; তবে নারী ও শিশুদের এর বাইরে রাখা হয়েছে, যাদের মুসলিমদের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গণিমত) হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে প্রথম মতটিই সঠিক, কারণ উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা হয়, তবে আমাদের কেবল তাদের সাথেই যুদ্ধ করা প্রয়োজন যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আল্লাহ বলেন (যার অর্থ):

"আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" [সূরা আল-বাকারাহ (২), আয়াত: ১৯০]

এর কারণ হলো, আল্লাহ কেবল সেই হত্যাটুকুরই অনুমতি দিয়েছেন যা সৃষ্টির কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয়: **"কেননা ফেতনা (নিপীড়ন/শিরক) হত্যা অপেক্ষাও মারাত্মক।"** [সূরা আল-বাকারাহ (২), আয়াত: ২১৭]

এর অর্থ হলো, কাফেরদের দ্বারা মুসলিমদের ওপর চালিত নিপীড়ন বা ফেতনা হত্যার চেয়েও নিকৃষ্ট, যদিও হত্যা নিজেই একটি মন্দ কাজ। যারা মুসলিমদের আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে বাধা দেয় না, তারা তাদের কুফরীর দ্বারা কেবল নিজেদেরই ক্ষতি করে। এই কারণেই **শরীয়ত** সামগ্রিকভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যকার অসহায়দের—যেমন নারী ও শিশুদের—হত্যা করার অনুমতি দেয়নি। তবে কোনো **কাফের** যদি যুদ্ধে বন্দী হয় বা অন্য কোনো পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার হয়, তবে মুসলিম শাসক সিদ্ধান্ত নেবেন যে তার কাছ থেকে কী ধরনের সুবিধা নেওয়া যেতে পারে: তাকে দাস বানানো, তাকে মুক্ত করে দেওয়া, তাকে হত্যা করা অথবা অর্থ বা কোনো মুসলিমের মুক্তির বিনিময়ে মুক্তিপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া। এটিই ইসলামের বহু স্কলারের (আলেম) মত, যা কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে কিছু স্কলার মনে করেন যে, [বিনা শর্তে] মুক্ত করে দেওয়া বা মুক্তিপণ নেওয়া রহিত হয়ে গেছে। আর আহলে কিতাব এবং অগ্নিউপাসকদের (মাজুস) ক্ষেত্রে, তারা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে ইসলাম গ্রহণ করে অথবা অবনত চিত্তে **জিযয়া** প্রদান করে। এগুলো ছাড়া অন্য কোনো গোষ্ঠীর কাছ থেকে **জিযয়া** নেওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে স্কলারদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে; তবে তাদের অধিকাংশেরই মত হলো যে, তা নেওয়া যাবে না।

মুসলিম স্কলারদের মধ্যে এই বিষয়েও সর্বসম্মত ঐক্য রয়েছে যে, ইসলামের অন্তর্ভুক্ত এমন যেকোনো গোষ্ঠী—যারা এর সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্পষ্ট আইনগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক আইন মেনে চলতে অস্বীকার করে—তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, যতক্ষণ না দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়। যারা **যাকাত** দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে আবু বকর (রা.)-এর পরিচালিত অভিযানে এটি স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছিল। হাদীস বর্ণনার বহু সূত্র থেকেও এটি প্রমাণিত যে, নবী (ﷺ) তাঁর সাহাবীদের **খাওয়ারেজ**-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতএব, কুরআন, সুন্নাহ এবং

মুসলিম স্কলারদের ঐকমত্যের (ইজমা) দ্বারা এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, যে কেউ ইসলামের আইনের বাইরে কদম বাড়াবে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে—এমনকি তারা মুখে শাহাদাহ বা ঈমানের দুটি সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করলেও। এই সমস্ত লোকের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর পর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। আর তারা যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধ শুরু করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আরও বেশি বাধ্যতামূলক এবং সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

কাফেরদের বিরুদ্ধে এবং ইসলামের কিছু আইন অমান্যকারীদের—যেমন **খাওয়ারেজ** এবং যারা **যাকাত** দিতে অস্বীকার করে—তাদের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক **জিহাদ** দুই প্রকারের হতে পারে: আক্রমণাত্মক অথবা আত্মরক্ষামূলক। এটি যদি প্রথম প্রকারের (আক্রমণাত্মক) হয়, তবে তা একটি সমষ্টিগত দায়িত্ব বা **ফরজে কিফায়াহ**; অর্থাৎ, মুমিনদের কোনো একটি দল যদি এটি পালন করে, তবে সম্প্রদায়ের বাকি লোক এর দায় থেকে অব্যাহতি পায় এবং যারা এটি সম্পাদন করে তারা তাদের ত্যাগের ফল বা সওয়াব লাভ করে, যেমনটি আল্লাহ (SWT) বলেন (যার অর্থ):

"মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে—অপারগ বা ক্ষতিগ্রস্ত (আঘাতপ্রাপ্ত, অন্ধ কিংবা খোঁড়া) ব্যক্তি ছাড়া—এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা ঘরে বসে থাকা লোকদের ওপর উন্নীত করেছেন। যদিও আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের (জান্নাতের) ওয়াদা করেছেন; কিন্তু আল্লাহ ঘরে বসে থাকা লোকদের ওপর জিহাদকারীদের মহা পুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; তাঁর পক্ষ থেকে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আন-নিসা (৪), আয়াত: ৯৫-৯৬]

কিন্তু শত্রু যখন মুসলিমদের আক্রমণ করতে চায়, তখন যুদ্ধ করা প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্ব বা **ফরজে আইন** হয়ে দাঁড়ায়; অর্থাৎ, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত মুসলিম এবং অন্য যেকোনো স্থানে অবস্থানরত সমস্ত মুসলিমের ওপর সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। যেমনটি আল্লাহ (SWT) বলেন (যার অর্থ):

"আর যদি তারা দ্বীনের [ব্যাপারে] তোমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য; কিন্তু এমন কোনো জাতির বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে।" [সূরা আল-আনফাল (৮), আয়াত: ৭২]

নবী (ﷺ) আমাদের সাধ্যানুযায়ী আক্রান্ত মুসলিমদের সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের সেই সামর্থ্য বা উপায় থাকুক আর না-ই থাকুক। আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে, ইসলামের প্রতিরক্ষা, এর পবিত্রতা এবং এর অনুসারীদের জীবন রক্ষার্থে কোনো একজন ব্যক্তিরও নিজের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ উৎসর্গ করা থেকে বিরত থাকার কোনো অজুহাত চলে না। খন্দকের যুদ্ধে (আহযাবের যুদ্ধ) শত্রুরা যখন মুসলিমদের আক্রমণ করেছিল, তখন মুসলিমরা ঠিক এটিই করেছিল। সেই সময়ে আল্লাহ কোনো মুসলিমকেই **জিহাদ** ত্যাগ করার অনুমতি দেননি, যেমনটি তিনি আক্রমণাত্মক জিহাদের ক্ষেত্রে দিয়েছিলেন—যেখানে মানুষ যুদ্ধ করতে যাওয়া এবং ঘরে বসে থাকা এই দুই দলে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ সেই সমস্ত লোককে তিরস্কার করেছিলেন যারা নবী (ﷺ)-এর কাছে পিছনে থেকে যাওয়ার জন্য অনুমতি চেয়েছিল (যার অর্থ):

"এবং তাদের একদল নবী (ﷺ)-এর কাছে এই বলে অনুমতি চাচ্ছিল: 'আমাদের ঘরবাড়ি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।' অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে তারা কেবল পালিয়ে যেতেই চেয়েছিল।" [সূরা আল-আহযাব (৩৩), আয়াত: ১৩]

এটি হলো দ্বীন, পবিত্রতা এবং মুসলিমদের জীবন রক্ষার এক প্রত্যক্ষ বহিঃপ্রকাশ। এটি একটি 'বাধ্যতামূলক যুদ্ধ'। তবে, আক্রমণাত্মক যুদ্ধ হলো 'স্বেচ্ছাপ্রণোদিত' এবং এর লক্ষ্য হলো দ্বীনকে বিজয়ী করা ও আল্লাহর শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করা; যেমনটি ঘটেছিল তাবুকের যুদ্ধ এবং অন্যান্য লড়াইয়ের ক্ষেত্রে।

আজ মুসলিমদের সামনে যে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে, **জিহাদ** তারই একমাত্র উত্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে: অর্থাৎ, মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকা নাকি অপমানের জীবন বেছে নেওয়া। আমরা যদি মর্যাদার সাথে বাঁচতে চাই, তবে আমাদের অবশ্যই আল্লাহর পথে **জিহাদ**-এর জন্য নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে। কিন্তু আমরা যদি **জিহাদ** বর্জনের ফলেই অপমানিত হওয়া বেছে নিই, তবে আমাদের কাছে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই অধিক প্রিয় হয়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি এমন এক চৌরাস্তাকে নির্দেশ করে যেখানে ইসলামের জন্য কাজ করা ব্যক্তিরা এসে দাঁড়িয়েছেন। কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন, কেউ কেউ বিচ্যুত হয়েছেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, আর অন্যরা অবিচল থেকেছেন, মর্যাদা পেয়েছেন এবং আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। তবে, অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই **জিহাদ**-এর ফলাফল ও দায়িত্বসমূহ মাথায় রাখতে হবে। আমাদের সাধ্যানুযায়ী এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, কারণ আমাদের হাতে নষ্ট করার মতো আর কোনো সময় নেই।

মুসলিমদের তাদের ঈমান বা বিশ্বাসের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা, তাদের খাঁটি আকীদা দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া এবং তাকওয়া ও সৎকর্মের পাথেয় সংগ্রহ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। আমাদের একটি অবিরাম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে যা ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে, যতক্ষণ না সমস্ত কুফরী শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, সমস্ত **জাহেলী** আইন ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায়, আমাদের খিলাফত পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আমাদের সমস্ত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করা হয়।

তখন আমরা এক হাতে তলোয়ার এবং অন্য হাতে কুরআন নিয়ে এগিয়ে যাব এবং সমগ্র মানবজাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বান করব। এটা সত্য যে, এই দায়িত্বটি পালন করা অত্যন্ত গুরুতর ও কঠিন হবে; কিন্তু আমাদের সমস্ত সক্ষম পুরুষ আজ এটি গ্রহণ করতে বাধ্য, অন্যথায় আমরা সবাই এই সমস্ত বাধ্যবাধকতা অবহেলা করার কারণে অপরাধী বা গুনাহগার হিসেবে গণ্য হব।

আমরা আজ নিঃসন্দেহে **জিহাদ** করতে বাধ্য। এই বাধ্যবাধকতা পূর্ণ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো বিষয় নিজেই একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য। আমরা নিজেদের প্রস্তুত করতে, আমাদের সারিবদ্ধতাকে সুবিন্যস্ত করতে, আমাদের সর্বোত্তমদের এগিয়ে দিতে এবং একজন একক মুসলিম নেতার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতেও বাধ্য। অতএব, আসুন আমরা লড়াই করি—

"...আল্লাহর পথে এবং পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যকার সেই সমস্ত দুর্বল, নির্যাতিত ও নিপীড়িতদের জন্য, যাদের আকুল প্রার্থনা হলো: 'হে আমাদের রব! আমাদের এই জনপদ থেকে উদ্ধার করুন যার অধিবাসীরা অত্যাচারী; এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন, আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন'।"

আসুন আমরা লড়াই করি,

"...যতক্ষণ না ফেতনা (নিপীড়ন/শিরক) অবসান ঘটে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়।"

আসুন আমরা লড়াই করি,

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াই করবে, অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী হোক, শীঘ্রই আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব।"

আসুন আমরা লড়াই করি,

**"আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ করো, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও রহমত তার চেয়ে অনেক উত্তম, যা তারা (পার্থিব ধন-সম্পদ ইত্যাদি) পুঞ্জীভূত করে।

আসুন আমরা লড়াই করি,

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনোই মৃত মনে কোরো না। বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত এবং তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।"

আসুন আমরা লড়াই করি,

"অতএব, যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করে দেয়, তারা যেন আল্লাহর পথে লড়াই করে।"

আসুন আমরা লড়াই করি,

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদের বেদনাদায়ক আজাব থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল [মুহাম্মদ (ﷺ)]-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।"

অধ্যায় ৬: সমকালীন বিশ্বে জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা ও আধুনিক প্রেক্ষাপট

এখানে পয়েন্ট আকারে অসংখ্য ভুল ধারণার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো—এসব মূল বিষয় নয়। তারা আসল বার্তাটি ঠিকই বুঝতে পারে; কিন্তু যেহেতু তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও কামনার অনুসারী, তাই সেই সত্যকে মেনে নিতে চায় না।

৯/১১ হামলার পর জর্জ ডব্লিউ বুশ বলেছিলেন যে মুসলমানদের দমন করে রাখতে হবে, নচেৎ তারা ইন্দোনেশিয়া থেকে স্পেন পর্যন্ত একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। বাস্তবতা হলো, একজন মুসলমান স্বাভাবিকভাবেই শরিয়াহভিত্তিক শাসনব্যবস্থা কামনা করবে এবং খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখতে চাইবে। কিন্তু তারা এই বিষয়টিকেই এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন এটি কোনো ভয়াবহ ও মানবতাবিরোধী ধারণা।

মূলত এটি একটি আদর্শিক (Ideological) যুদ্ধ। সেক্যুলারিজমের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষের হত্যার কোনো জবাব তাদের কাছে নেই; অথচ ইসলামের নামে যদি শত বা দুই শত মানুষও নিহত হয়, তারা সেটিকে হাজার গুণ বড় করে প্রচার করে। তারা বোঝাতে চায় যে মুসলমান মানেই কাফিরদের হত্যা করতে চায়, তাদের জবাই করতে চায়। অর্থাৎ তারা তথ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না; বরং সেটিকে ভিন্ন কাঠামোতে (frame) উপস্থাপন করে।

উদাহরণস্বরূপ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যদি কেউ অবমাননা করে, একজন মুসলমান তা কখনোই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারবে না। রাষ্ট্র যদি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তবে রাষ্ট্রেরই ব্যর্থতা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কেউ না কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেবেই। কারণ তার কাছে তখন রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘনের বিষয়টি অপেক্ষাকৃত গৌণ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার সামনে এসব বিষয় তুচ্ছ হয়ে পড়ে।

তবে একটু চিন্তা করে দেখুন, রাষ্ট্র কেন এ ধরনের ঘটনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে না? যে রাষ্ট্র সর্বদা বলে থাকে—"আইন সবার জন্য সমান", বাস্তবে সেই নীতির প্রয়োগ কোথায়? এমনকি মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলোতেও মুসলমানদের সবচেয়ে প্রিয়

ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ্যে গালি দেওয়া হলেও অনেক সময় তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না; বরং রাষ্ট্রই তাকে নিরাপত্তা প্রদান করে।

তাহলে কি রাষ্ট্রের কাছে কোনো পবিত্র বিষয় নেই? অবশ্যই আছে। রাষ্ট্র তার সংবিধানকে পবিত্র মনে করে, তার পতাকাকে পবিত্র মনে করে। অথচ 'পবিত্রতা' ধারণাটিই মূলত ধর্মীয় উৎস থেকে আগত। কিন্তু যখন ধর্মীয় পবিত্রতার প্রশ্ন আসে, তখন তারা ভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ করে।

অতএব, বিষয়টি এই নয় যে তারা এসব বিষয় বোঝে না। বরং তারা বোঝে, কিন্তু নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাব ব্যবহার করে ইসলামকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। কারণ তারা নিজেদের জীবনব্যবস্থা ও প্রবৃত্তিনির্ভর সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করতে চায় না। অথচ ইসলাম এসেছে মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্বের দিকে নিয়ে যেতে, অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করতে।

কিন্তু তারা নিজেদের জীবনধারাকেই আলোর পথ হিসেবে চিহ্নিত করে, যদিও বাস্তবে সেখানে ক্রমাগত ধর্ষণ, হত্যা, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা যখন তাদের আধুনিক যুদ্ধবিমান দিয়ে বোমাবর্ষণ করে, তখন সেটিকে বৈধতা দেওয়া হয়; কিন্তু সেই চরম জুলুমের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ একটি পাথর নিক্ষেপ করলেও তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সুতরাং তাদের এই তথাকথিত 'ভুল ধারণা' আসলে ভুল বোঝাবুঝি নয়; বরং ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা। এটি সেই ব্যক্তির মতো, যে ঘুমিয়ে নেই, বরং ঘুমের ভান করে আছে। ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো যায়, কিন্তু যে ঘুমের ভান করে, তাকে জাগানো সম্ভব নয়।

খারিজি চিন্তাধারা

ইসলামের ইতিহাসে খারিজিরা কুরআনের আয়াতকে আংশিকভাবে ব্যবহার করে মুসলিম সমাজে চরমপন্থা সৃষ্টি করেছিল। অনেক সমকালীন আলেম মনে করেন যে আধুনিক কিছু উগ্রবাদী চিন্তাধারার সাথে খারিজিদের কিছু বৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া যায়। যদিও এগুলার জন্মের পিছনেও পশ্চিমাদের হাত রয়েছে।

আধুনিক বিশ্বে জিহাদের রূপান্তর

- আধুনিক জিহাদের রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করলে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যাখ্যা থাকবে। তবে অধিকাংশ ব্যাখ্যার মধ্যে একটি বিষয় সাধারণভাবে বিদ্যমান

থাকে—কীভাবে জিহাদের মৌলিক শিক্ষা, বিশেষত সশরীরে সংগ্রামের ধারণা, তা থেকে মানুষকে দূরে রাখা যায়।

- সাধারণত বলা হয়, বর্তমান যুগ হলো সভ্যতার যুগ, বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির যুগ। তাই এখন যুদ্ধ হবে জ্ঞানের, অর্থনীতির, প্রযুক্তির কিংবা বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে। কথাগুলো শুনলে মনে হয় যেন বিশ্বশক্তিগুলো নিজেরাও কেবল এসব ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা করছে। কিন্তু পর্দার আড়ালে রয়েছে তাদের আরেকটি বাস্তব চেহারা—একটি অন্ধকার সত্য। মুসলমানদের এমন ধারণা শেখানো হয় যাতে তারা জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য থেকে দূরে থাকে; অথচ একই সময়ে গাজা, আরাকান, লেবানন, কাশ্মীর, পূর্ব তুর্কিস্তান (উইঘুর অঞ্চল) এবং চেচনিয়ার মতো অঞ্চলগুলোতে একের পর এক দমন-পীড়ন অব্যাহত থাকে। আর যেহেতু বৈশ্বিক গণমাধ্যমের বড় একটি অংশ তাদের প্রভাবাধীন, তাই পূর্বপরিকল্পিত বয়ান (framing)-এর খেলাও চলতে থাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে।
- এ কারণেই ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর সেই বিখ্যাত বক্তব্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক যে, এ উম্মাহর শেষাংশের সফলতা ও সংশোধনও সেই পথেই নিহিত, যে পথে এর প্রথম প্রজন্ম সফল হয়েছিল। সুতরাং আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই ধ্রুপদী ইসলামী মনীষীদের শিক্ষার কাছে; ফিরে যেতে হবে সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর পদাঙ্ক অনুসরণের দিকে, যাঁরা নিজেদের জীবন গড়ে তুলেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যক্ষ শিক্ষার আলোকে।
- এটিও সত্য যে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বাস্তব কারণে প্রতিটি মুসলিম দেশে একই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না, কিংবা সর্বত্র একইভাবে সশরীরে জিহাদ শুরু হয়ে যাবে—এমন ধারণাও বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'আলা যে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন, তার কতটুকু আমরা বাস্তবে গ্রহণ করছি?
- প্রস্তুতি কি কেবল শারীরিক সক্ষমতা অর্জন, জিমে অনুশীলন করা বা তীরন্দাজি শেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? নিঃসন্দেহে এগুলো তার একটি অংশ। তবে আজ উম্মাহর যুবসমাজ এমন এক হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত যে তারা নিজেদের মুসলিম পরিচয়কেই গর্বের সঙ্গে ধারণ করতে পারছে না। তাদেরকে তাদের প্রকৃত আদর্শপুরুষদের সম্পর্কে জানানো হয় না; শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের ইতিহাস ও অবদানকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। একই সঙ্গে ইতিহাসজুড়ে মুসলিম সমাজের

বিরুদ্ধে কাজ করা শক্তিগুলো সম্পর্কেও তাদের যথাযথ সচেতনতা তৈরি করা হয় না।

- ম্যালকম এক্স (রহিমাহুল্লাহ)-এর একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে:

"যদি তুমি সতর্ক না থাকো, তবে সংবাদপত্র তোমাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাবে যে তুমি নিপীড়িতদের ঘৃণা করবে এবং নিপীড়কদের ভালোবাসবে।"

- আজ বাস্তবতাও অনেকাংশে তেমনই। যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থা, নৈতিকতা ও জীবনদর্শনের বিভিন্ন দিককে তাদের নিজেদের সমাজের বহু মানুষ প্রশ্নবিদ্ধ করছে এবং যার নানা সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, সেই একই মডেলকে আমাদের উপমহাদেশের অনেক তরুণ-তরুণী উন্নততার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করছে। তাদের ব্যস্ততা আবর্তিত হচ্ছে খেলাধুলার তারকা, বিনোদন, কনসার্ট ও অবসর সংস্কৃতিকে ঘিরে।
- অথচ খায়রুদ্দীন বারবারোসা, তারিক ইবন যিয়াদ, সালাহউদ্দীন আইয়ুবী এবং মুসলিম ইতিহাসের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। আধুনিক সাংস্কৃতিক প্রবাহ এমনভাবে সমাজে অশ্লীলতা ও ভোগবাদকে ছড়িয়ে দিয়েছে যে বহু মানুষ তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও গন্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে।
- এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন আমূল পরিবর্তন। এই পরিবর্তন তলোয়ার শাণিত করার মাধ্যমে শুরু হবে না। কারণ সে পথে অগ্রসর হতে গেলে দেখা যাবে, সমাজের অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষও তার বিরোধিতায় দাঁড়িয়ে যাবে। বরং প্রথম প্রয়োজন সচেতনতা সৃষ্টি, সহীহ ইলমের প্রচার এবং প্রচলিত বয়ানের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ।
- মানুষ যখন উপলব্ধি করবে যে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে নিরপেক্ষ অবস্থান বলে কিছু নেই, তখন তাকে এক অবস্থান বেছে নিতেই হবে। এই বোধের স্পষ্টতা ও আদর্শিক বিভাজনই মূলত প্রয়োজন। নবী ও রাসূলগণ মানবজাতির সামনে হুজ্জত প্রতিষ্ঠা করেছেন, সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন এবং মানুষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের দায়িত্বও সেই সত্যকে স্পষ্টভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা।
- যখন সত্য ও অসত্যের সীমারেখা মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখনই তারা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে এবং

নিজেদের বিশ্বাস ও আদর্শের দাবির প্রতি অধিকতর দায়বদ্ধ হয়ে উঠবে। আর তখনই ঈমান এবং কুফরের যেই চিরসংঘাত সেটা লেগে যাবে এবং আল্লাহ অবশ্যই ঈমানদারদের বিজয়ের ওয়াদা দিয়েছেন।

সমকালীন বিশ্বে জিহাদের ইতিবাচক মডেল

আধুনিক যুগে একজন মুসলিমের জন্য আফগানিস্তানের তালেবানরা একটা রোল মডেল। মালীতে আশ-শাবাব, ফিলিস্তিনে হামাস - মূলত আহলুস সুন্নাহর যারাই এই উম্মাহর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের হাল ধরেছেন তাদের কার্যক্রম থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া যেতে পারে।

৬.৯ উপসংহার

সমকালীন বিশ্বে জিহাদ সম্পর্কে প্রচলিত অধিকাংশ ভুল ধারণা কুরআন ও সুন্নাহর সামগ্রিক শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জিহাদ কোনোভাবেই সন্ত্রাসবাদ, অন্ধ সহিংসতা বা জোরপূর্বক ধর্মান্তরের নাম নয়। বরং এটি সত্য প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার রক্ষা, মানবকল্যাণ, আত্মশুদ্ধি এবং সমাজ সংস্কারের জন্য সর্বাত্মক বৈধ প্রচেষ্টার নাম। আধুনিক বিশ্বে জ্ঞান, শিক্ষা, গবেষণা, সামাজিক উন্নয়ন এবং মানবিক সেবাকে জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়। অতএব জিহাদের প্রকৃত ধারণা পুনরুদ্ধার করা বর্তমান মুসলিম সমাজ এবং বৈশ্বিক শান্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র (References)

ক. প্রাথমিক উৎস

১. আল-কুরআনুল কারীম।
২. সহীহ আল-বুখারী।
৩. সহীহ মুসলিম।
৪. সুনান আবু দাউদ।
৫. জামি‘ আত-তিরমিযী।
৬. সুনান আন-নাসাঈ।
৭. সুনান ইবনে মাজাহ।

খ. তাফসীর গ্রন্থ

১. তাফসীর ইবনে কাসীর।

২. জামিউল বায়ান।

৩. আল-জামি‘ লি আহকামিল কুরআন।

৪. ফাতহুল কাদীর।

৫. মা‘আরিফুল কুরআন।

গ. ফিকহ ও আকীদা

১. আল-মুগনী।

২. আল-মাজমু‘।

৩. আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ।

৪. মাজমূ‘ আল-ফাতাওয়া।

৫. যাদুল মাআদ।

ঘ. সীরাত ও ইতিহাস

১. আর-রাহীকুল মাখতূম।

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া।

৩. সীরাতে ইবনে হিশাম।

৪. তারীখ আত-তাবারী।

ঙ. আধুনিক গবেষণা

১. Fiqh al-Jihad।

২. Jihad in Islamic History।

৩. Islam and the Ethics of War।

৪. বিভিন্ন পিয়ার-রিভিউড জার্নাল, গবেষণা নিবন্ধ ও একাডেমিক প্রবন্ধ।

৫. In Pursuit of Allahs Pleasure [Author: Dr.Naaha Ibrahim, Asim Abdul Maajid & Essam-ud-Deen Darbaalah]